ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্টের গ্রন্থ
বিজ্ঞান বিচিত্রা
শ্রীচন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন
পাব্‌লিকেশন্‌স্‌ ডিভিশন

1972

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের গ্রন্থ

বি জ্ঞা ন - বি চি ত্রা

শ্রীচন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন

অনুবাদ :
শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

পাব্লিকেশন্স্ ডিভিশন
মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং
গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, দিল্লী ৮

November 1960 (Agrahayana 1882)

নভেম্বর ১৯৬০ (অগ্রহায়ণ ১৮৮২ শক)

৭৫ ন· প·

75 nP.

ASPECTS OF SCIENCE

(Bengali)

মুদ্রাকরঃ আনন্দ প্রেস, নিউ দিল্লী ১

প্রকাশকঃ অধিকর্তা, প্রকাশন বিভাগ, দিল্লী ৮

সূচীপত্র

১। নব্য পদার্থবিজ্ঞান

আমার এই ভাষণ যাঁরা শুনছেন তাঁদের মধ্যে কোন আইরিশম্যান থাকলে তিনি সম্ভবত প্রশ্ন করতে চাইবেন—আমি যে বিষয়ে বলছি সেই নব্য পদার্থবিজ্ঞানের বয়স কত? আমার উত্তর, নব্য পদার্থবিজ্ঞানের বয়স এখন ঠিক তেতাল্লিশ বছর। এই নবজাতকের জন্মকালে সমগ্র পৃথিবী তার চিৎকারধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। আমি সেই বিপুল উত্তেজনার কথাই বলছি যার সৃষ্টি হয়েছিল যখন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী র‍্যণ্টগেন আশ্চর্য গুণসম্পন্ন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিকিরণ আবিষ্কারের * কথা ঘোষণা করেন—তাঁর নামানুসারে যা র‍্যণ্টগেন রশ্মি বা এক্স-রশ্মি নামে এখন পরিচিত। র‍্যণ্টগেনের এই আবিষ্কারের ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। অতঃপর বিজ্ঞানীদের এই প্রতীতি জন্মায় যে সাহসিক ও অধ্যবসায়ী গবেষক ঊনবিংশ শতকের প্রাকৃতিক দর্শনের পক্ষে স্বপ্নাতীত নব নব প্রাকৃতিক ঘটনা আবিষ্কারের আশা পোষণ করতে পারেন। বস্তুত, নব্য পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রপাত র‍্যণ্টগেনের আবিষ্কার থেকেই। নতুন ধরনের পরীক্ষণ চালাবার যে প্রেরণা এর কল্যাণে সঞ্চার লাভ করে তার ফলে এমন বহু অভিনব আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছে যাদের অনেকগুলির নিজস্ব মূল্য ও গুরুত্বকে র‍্যণ্টগেনের অপূর্ব আবিষ্কারও অতিক্রম করতে পারে না। গত চার দশক ধরে পদার্থবিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কারের বন্যা এমন অপ্রতিহত বেগে বয়ে চলেছে যে আবিষ্কর্তা ছাড়া অন্য বিজ্ঞানীর পক্ষে কোন নতুন আবিষ্কারে রোমাঞ্চ বোধ করা ক্রমশ দুষ্কর হয়ে উঠছে।

আজকের পদার্থবিজ্ঞান যে-সব বিজ্ঞানী গড়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় এমন কি তাঁদেরও নামের তালিকা শুনিয়ে আপনাদের ক্লান্তি উৎপাদন করতে চাই না। পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যেক শিক্ষার্থীই তাঁদের নাম এবং আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত। বিভিন্ন দেশের কোন না কোন একটির লোক বলে তাঁদের মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সমগ্র পৃথিবীর তথা বিজ্ঞানজগতের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃগোষ্ঠীর লোক। আমি মাত্র দুজন শ্রেষ্ঠ পথিকৃতের উল্লেখ করব। আমার মতো বিজ্ঞানী যে-সব অমূল্য স্মৃতি আজীবন সযত্নে লালন করেন, তাদের একটি স্বর্গত লর্ড রাদারফোর্ড এবং মাদাম ক্যুরির মতো বিজ্ঞান-পুরোধার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। নব্য পদার্থবিজ্ঞান গঠনে এই দুজনের দান সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের প্রগতি এবং সমকালীন যুগের উপর এঁদের প্রভাব অবিশ্বাস্যরূপে বিরাট।

এই নব্য পদার্থবিজ্ঞান কেবলমাত্র পরীক্ষণরত বিজ্ঞানীদের কাজের উপরেই গড়ে উঠেছে এই ধারণা যদি আমার শ্রোতাদের মনে সূচিত করে থাকি, তাহলে আমার বক্তব্য বিষয় এবং শ্রোতাদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। প্রকৃত ব্যাপার মোটেই তা নয়।

---

* র‍্যণ্টগেন রশ্মি আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর—অনুবাদক।

নব্য পদার্থবিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতিসাধনে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীদের নির্ভীক নেতৃত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন পথপ্রদর্শনের কৃতিত্ব কম নয়। এই সব তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা আবার তাঁদের গবেষণা গড়ে তুলেছেন পরীক্ষালব্ধ আবিষ্কারের দৃঢ় ভিত্তির উপর। আমার বিশ্বাস, আমার শ্রোতাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি আইনষ্টাইনের নাম বা তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শোনেন নি। এই তত্ত্ব নব্য পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাধারার কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু সকলেই নিশ্চয় কোপেনহাগেনের অধ্যাপক নীল্‌স্‌ বোরের নাম শোনেন নি। বাঙ্গালোরে আমার বাড়ীর সিঁড়ির মাথায় মুখোমুখি অধ্যাপক বোর ও লর্ড রাদারফোর্ডের ছবি টাঙান আছে। অধ্যাপক বোর প্রায়ই তাঁর শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেন যে তিনি ইয়োরোপের ক্ষুদ্রতম দেশগুলির অন্যতম—ডেনমার্কের অধিবাসী। কিন্তু অনেকের মতে—তাঁদের মধ্যে আমিও একজন—তিনি বর্তমান কালের প্রাকৃতিক দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মানব মানসের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের অন্যতম হচ্ছে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নীল্‌স্‌ বোরের তত্ত্ববিচার, যা অসংখ্য বিজ্ঞানীকে পরীক্ষণের প্রেরণা জুগিয়েছে। এ কথা মনে করা যেতে পারে যে পারমাণবিক স্বতঃভাঙন এবং রূপান্তর যে-সব সমস্যার অবতারণা করেছে, তাদের মধ্যে যেগুলির সমাধান আজও হয় নি, বর্তমানকালের মহত্তম চিন্তানায়করূপে অধ্যাপক বোর সেই সব পরীক্ষার ফলকে ভবিষ্যতে অধিকতর প্রাঞ্জল করবার পথ প্রদর্শন করতে পারবেন।

আপনারা স্বভাবতই প্রশ্ন করতে পারেন, নব্য পদার্থবিজ্ঞানের কীর্তি কি? আজকের পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে ত্রিশ বছর আগের মাদ্রাজে আমার কলেজ-জীবনের পাঠ্য পদার্থবিজ্ঞানের তুলনা করলেই এই দুইএর পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাবে। প্রাচীন পদার্থবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ছিল যাকে বলা যায় প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাহ্যাকৃতিক বা সমষ্টিগত বিচার—অর্থাৎ পদার্থের ধর্ম, তাপ, আলোক, চুম্বকত্ব ও তড়িৎ সম্পর্কে দৃষ্ট ঘটনাবলীর বিবরণ দান। অপর পক্ষে, কয়েকটি নিতান্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া আণবিক বা পারমাণবিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষিত ঘটনার ব্যাখ্যার প্রচেষ্টায় তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। এই অসাফল্যের কারণ প্রাচীন পদার্থবিজ্ঞানের এমন বনিয়াদ ছিল না যার উপর নতুন কিছু গড়া যায়। যা দিয়ে পদার্থ গঠিত সেই সব উত্তর-পরমাণবিক কণিকা এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার নিয়ম আবিষ্কারে এই বনিয়াদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুতরাং সকল ভৌত ঘটনা এবং পদার্থের ভৌত ধর্ম সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচার এখন সম্ভবপর হয়েছে। প্রাচীন পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যেকটি প্রচলিত বিভাগেই এই সম্পর্কে প্রভূত সাফল্য সংঘটিত হয়েছে। অধিকন্তু, প্রাচীন পদার্থবিজ্ঞানে যা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না এমন সব নতুন বিষয়ের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং তা নব্য পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মভুক্ত হয়েছে।

এই সব কীর্তিতে পরিতৃপ্ত না হয়ে নব্য পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে; রসায়নের নিয়ম অনুসারে পরমাণুদের পারস্পরিক ক্রিয়ার যে অণু গঠিত হয় সে সম্বন্ধে সুপরীক্ষিত ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা উত্তর-পারমাণবিক ক্রিয়ার

ভিত্তিতে দিতে চেষ্টা করেছে। কাজটি অনাবশ্যক মনে করা সঙ্গত হবে না। কারণ রসায়নবিজ্ঞানের একটি মূলগত ঘটনা এই যে রাসায়নিক সংযোগের প্রাবল্য এবং সেই সংযোগের জন্য আবশ্যক অথবা তদ্দ্বারা মুক্ত শক্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। কেবলমাত্র পদার্থবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই এই ঘটনাসমূহের তথা রাসায়নিক সংযোগের স্বরূপ সম্যক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 'রাসায়নিক পদার্থবিজ্ঞান' আখ্যাত এই নতুন বিজ্ঞানটি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। এমন কি এ কথা মনে করা অসংগত হবে না যে অদূর ভবিষ্যতে তাত্ত্বিক রসায়ন গণিতের একটি শাখা হিসাবে পরিগণিত হবে।

এই অসামান্য সাফল্যের গোপন তত্ত্বটি কি? সংক্ষেপে বলা চলে, আণবিক ও পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে নিউটনের যান্ত্রিক বিধিসমূহের বর্জন এবং তৎপরিবর্তে উত্তর-পারমাণবিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পৃথক নিয়মাবলীর প্রবর্তন। নব্য পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অংশের সকল দিকের পর্যালোচনা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যে এর ফলে প্রাকৃতিক ঘটনার তথা সেই সব ঘটনার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে অধিগত তথা আত্মসাৎ করবার যথেষ্ট সময় সমকালীন ব্যক্তিরা এখনও পান নি, যদিও বিভিন্নবিষয়ক সমস্যার পর্যালোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি তার সার্থকতার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়েছে। আশা করা যায় যে বিজ্ঞানে এই নতুন চিন্তা-ধারা, যার প্রয়োজন বর্তমানে রয়ে গেছে, আগামী যুগের মানুষের পক্ষে তা নিতান্তই অভ্যাসগত হয়ে দাঁড়াবে।

নব্য পদার্থবিজ্ঞানের বহু বিজয়-গৌরবের মধ্যে সাম্প্রতিক একটির কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করলে ত্রুটি হবে। সেটি হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে সুপরিচিত রাসায়নিক মৌলের অন্য মৌলে রূপান্তর। লর্ড রাদারফোর্ডের শেষ লেখা 'দি নিউআর অ্যালকেমী' (নবতর কিমিয়াবিদ্যা) নামক পুস্তিকায় এই অভিনবতম পদার্থবিজ্ঞানের একটি মনোমুগ্ধকর পরিচয় পাওয়া যায়। বইটিতে যে-সব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা বর্ণিত হয়েছে তা কোন আকস্মিক আবিষ্কারের ফল নয়—নব্য পদার্থবিজ্ঞানের যা বৈশিষ্ট্য সেই পরমাণু ও তার গঠন সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক পর্যালোচনার স্বাভাবিক পরিণতি। কোন মৌলের রাসায়নিক অনন্যতা পরমাণুর কেন্দ্রক অর্থাৎ মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র ঘন অংশের উপর নির্ভরশীল। অপর কোন দ্রুতগতি পারমাণবিক প্রাস দিয়ে সংঘাতে পরমাণুর রূপান্তর ঘটান যেতে পারে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উৎপন্ন নতুন মৌলগুলি তেজস্ক্রিয়, অর্থাৎ স্বভাবত তেজস্ক্রিয় মৌলের মতো এগুলোও তড়িদাহিত কণিকা বিকিরণ করে অপর মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

রাসায়নিক মৌলের এই নবতর সংশ্লেষণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রুতগতি পারমাণবিক প্রাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বহুতর আশ্চর্য যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যাতে বৃহদাকারের তড়িৎ-চুম্বক, স্থিরতড়িৎ-উৎপাদক বা তড়িৎ-পরিবর্তক কাজে লাগান হয়। বিশেষ যান্ত্রিক কৌশল দ্বারা এইগুলির সাহায্যে কণিকাগুলির বেগ এমন

প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি করা হয় যাতে তাদের শক্তি কয়েক নিযুত ভোল্টের সমতুল্য হয়। গত বছরে আমি যখন প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে * যোগ দিতে যাই তখন এবং পরবর্তী সফরের সময় এই প্রকার অনেকগুলি যন্ত্রসজ্জা এবং তাদের ক্রিয়াকৌশল দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। পরিকল্পনার অভিনবত্বে ও বলিষ্ঠতায় এবং এদের প্রয়োগের উদ্দেশ্যসমূহে এই সব যন্ত্র নব্য পদার্থবিজ্ঞানের মর্মসত্যের সুযোগ্য প্রতীক।

নব্য পদার্থবিজ্ঞান যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তার ফলে প্রাকৃতিক শক্তিকে ভাল বা মন্দ কাজে লাগাবার ক্ষমতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অগ্রসর-পর্বে পদার্থবিজ্ঞান মানুষের জীবন ও কার্যকলাপ বহুভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এ কথা আপনারা যেন বিস্মৃত না হ'ন যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরাই নেতৃত্বে শীর্ষস্থানীয় হয়েছেন যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চা।

* অধ্যাপক রামন অনুবাদককে জানিয়েছেন, এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল আগস্ট ১৯৩৭।

২। সাম্প্রতিক সংবাদে পদার্থবিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণার উদ্দেশ্য হ'ল প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্পর্কে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর উপলব্ধি। পদার্থবিজ্ঞানীর কাজ ভৌত জগতের উপাদান যে-সব ক্ষুদ্রতম কণিকা বা অপর কিছু দিয়ে গঠিত তাদের এবং তাদের আচরণ-নিয়ামক বিধির আবিষ্কার। এই সন্ধান প্রতি বছর পদার্থবিজ্ঞানীদের দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে চলেছে। এই পথের শেষ এখনও দৃষ্টির নাগালের বাইরে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে জ্ঞানসম্পদ সঞ্চিত হয়েছে তা বিপুল। কৃপণের ধনের মতো তা কোন সিন্দুকে বন্ধ করা নেই। গ্রহণেচ্ছু সকলকেই তা অকাতরে বিতরণ করা হচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানীর আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনাসমূহ যন্ত্রশিল্পী, রসায়নবিদ এবং জীববিজ্ঞানীর হাতিয়ার হয়ে কালক্রমে জগতের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য অমিত পরিমাণে বাড়িয়ে চলে।

আমি আগেই বলেছি পদার্থবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য ঘটনার গভীর থেকে গভীরে অনুসন্ধান। তার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের এমন সব কাজে ব্যাপৃত হতে হয় যার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় কোন সম্পর্ক নেই বলে অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণার বিষয় কিছু আলোচনা করছি। বহু কৃতী পদার্থবিজ্ঞানীর মনোযোগ এখন এই বিষয়ে নিবদ্ধ দেখা যায়। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে অধ্যাপক আর এ মিলিক্যান আমাদের অতিথিরূপে সম্প্রতি বাঙ্গালোরে কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন।* অধ্যাপক মিলিক্যান মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় পথিকৃৎদের অন্যতম। তাঁর সহকারীদের নিয়ে তিনি ভারতে আসেন বিশেষ করে এদেশীয় ভৌগোলিক অক্ষাংশে মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়া পর্যালোচনা করতে, এই রশ্মির উৎস সম্পর্কে কোন আলোকসম্পাত হতে পারে এই আশায়। বিষয়টি এখন পর্যন্ত রহস্যাবৃত, কিন্তু এই রশ্মির ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা বহুলভাবে পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। রাত্রে নক্ষত্রালোকরূপে যেটুকু শক্তি পৃথিবীতে পৌঁছায়, মহাজাগতিক রশ্মি থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ প্রায় তারই সমান; সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে এর মূল্য যৎসামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু মহাজাগতিক রশ্মির গুরুত্ব বাস্তবিক যথেষ্ট বিশেষ করে তার আকারের জন্যই। মহাজাগতিক রশ্মি আমরা পাই বিচ্ছিন্ন কণিকারূপে, যে কণিকার শক্তির পরিমাণ বহু নিযুত, কখনও কখনও কয়েক শত কোটী, ইলেকট্রন-ভোল্ট। অতি আধুনিক যন্ত্র দিয়েও আমরা আমাদের পরীক্ষাগারে যা তৈরি করতে পারি, এ শক্তি তার চাইতে অনেক অনেক বেশী। মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণার প্রবল আকর্ষণের হেতু ঠিক এইটিই—প্রতিটি কণিকার শক্তির বিশালত্ব। কারণ এর সাহায্যে

---

* অধ্যাপক মিলিক্যান বাঙ্গালোরে ছিলেন ১৯৪০ জানুয়ারী মাসে। সংবাদটি জানিয়েছেন অধ্যাপক রামন।

এমন অনেক ঘটনা আমাদের গোচরে আসার সম্ভাবনা যার অনুকল্প আমরা কোন বেধশালায় সংঘটিত করার আশাও করতে পারি না।

মহাজাগতিক রশ্মি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে অথবা কোন জড়পদার্থে বাধা পায় তখন তা জোড়ায় জোড়ায় ধন ও ঋণতড়িদাহিত ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে। বাস্তবিক পক্ষে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কীয় গবেষণা প্রসঙ্গে ধন-তড়িদাহিত ইলেকট্রন—যার একটি নাম পজিট্রন—আবিষ্কৃত হয়।* আর একটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক আবিষ্কার, এক বিশেষ ধরনের কণিকা—যাকে ভারী ইলেকট্রন, মেসোট্রন বা মেসন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এই কণিকার আবিষ্কারও মহাজাগতিক রশ্মি-বিষয়ক গবেষণাপ্রসঙ্গে ঘটেছে। এই নবাবিষ্কৃত কণিকার একটি বিশেষ ধর্ম তা স্বতঃই সাধারণ ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যায়, কাজে কাজেই মেসনের জীবৎকাল নিতান্তই স্বল্প। যে মুহূর্তে ভারী ইলেকট্রন সাধারণ ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হবার কৌশল দেখাচ্ছে ঠিক সেই বিশেষ ক্ষণে মেঘ-প্রকোষ্ঠে ভারী ইলেকট্রনের পথরেখার ফোটোগ্রাফ তুলতে সমর্থ হয়েছেন জনৈক ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী।

সর্বদা না হলেও কখনও কখনও মহাজাগতিক রশ্মি সাধারণ পদার্থ থেকে এমন সব তড়িদাহিত কণিকা বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারে যে-গুলো ইলেকট্রন বা মেসনের চেয়ে বহুগুণ ভারী। এই ভারী কণিকাগুলির প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ণীত হয় নি, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলি প্রোটন অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ধনতড়িদাহিত কেন্দ্রক। সম্ভবত, পদার্থের অভ্যন্তর দিয়ে প্রধাবিত হবার সময় মহা-জাগতিক রশ্মি সেই পদার্থে বর্তমান অন্য কোন রাসায়নিক মৌলের কেন্দ্রক থেকে এই কণিকা বিচ্ছিন্ন করে আনে।

মহাজাগতিক রশ্মি পর্যবেক্ষণের জন্য বিবিধ সুকৌশলী উপায় অবলম্বিত হয়েছে। এর একটি মেঘ-প্রকোষ্ঠ—একটু আগেই যার উল্লেখ করেছি। এই যন্ত্রে আবদ্ধ আর্দ্র বাতাসের মধ্য দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মিকণিকা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্প্রসারিত হয়। সম্প্রসারণের ফলে বাতাস শীতল হয়ে যায় এবং রশ্মিকণিকার পথ-বরাবর শিশিরবিন্দু জমে। এই ভাবে রশ্মিকণিকার পথরেখা দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাৎক্ষণিক আলোকসম্পাতে তার ফোটোগ্রাফও তোলা যায়। কোন কোন পরীক্ষায় প্রবল তড়িৎ-চুম্বকের দুই মেরুর মাঝখানে মেঘ-প্রকোষ্ঠটি স্থাপিত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ায় জাত ধাবমান কণিকাগুলি বক্রপথে চালিত হয়। এই বক্রতার পরিমাণ এবং পথরেখার ঘনত্বের সযত্ন পর্যালোচনা দ্বারা পথরেখা সৃষ্টির মূলে বর্তমান কণিকাগুলির প্রকৃতি, তড়িদাধান এবং শক্তি নির্ণয় করা সম্ভব। জনৈক উৎসাহী আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী সম্প্রতি মেঘ-প্রকোষ্ঠ, তড়িৎ-চুম্বক, ক্যামেরা প্রভৃতি নিয়ে এরোপ্লেনে ৩০,০০০

* এ সম্পর্কে বিশদতর বিবরণের জন্য ১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য—অনুবাদক।

ফুট উঁচুতে ওঠেন। মহাজাগতিক রশ্মির সংঘাতে পরমাণু-কেন্দ্রকের বিস্ফোরণ কেমন ভাবে ঘটছে তার অনেকগুলি সুন্দর ফোটোগ্রাফ তিনি তুলতে পেরেছিলেন।

গাইগার গণক নামে মহাজাগতিক রশ্মিকণিকা গণবার একটি ভারী কুশলী যন্ত্র আছে। যন্ত্রটির কার্যপ্রণালীর মূলসূত্র এইঃ একটি নলে স্থিত গ্যাস বা বাষ্পের মধ্য দিয়ে মহাজাগতিক রশ্মিকণিকা চালিত হলে, মুহূর্তের জন্য তা তড়িৎ-পরিবাহী হয়ে ওঠে, ফলে একটি সহায়ক তড়িৎ-পথে তড়িৎ-প্রবাহ চালিত হয়ে একটি গণক-যন্ত্রকে সক্রিয় করে। এই রকম দুটি বা তিনটি নল যদি সমসূত্রে রাখা হয় এবং এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যে রশ্মিকণিকা সব কটিকে ক্রমান্বয়ে ভেদ করে গেলেই তবে তা সক্রিয় হয়ে উঠবে, তাহলে যন্ত্রসজ্জাটি মহাজাগতিক রশ্মির উপযোগী দূরবীক্ষণের কাজ করবে এবং রশ্মি কোন দিক থেকে আসছে সেই দিকেরও নির্দেশ দিতে পারবে।

মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় আহৃত নবলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানীদের আগ্রহ ও অনুরাগ সুগভীর। একথা বলা বাহুল্য যে এই জ্ঞানসম্পদ কালক্রমে মানবজাতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করবে এবং পরিণামে জগতের মঙ্গল-সাধনে সহায়তা করবে। কিন্তু যাঁরা এই খেলার অধিকাংশ দেখতে পাচ্ছেন না সেই দর্শকদের ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৩। খোলক

অনেকে হয়তো মনে করবেন সমুদ্রের ধারে ঝিনুক বা খোলক সংগ্রহ আজকের দিনে নিতান্তই শিশুসুলভ আমোদ বিশেষ। এক শ' বছর আগে খোলক সংগ্রহ ফ্যাশনদুরস্ত শখ বলে গণ্য হ'ত। দুষ্প্রাপ্য এবং সুন্দর খোলকের জন্য শৌখীন শঙ্খসংগ্রাহকরা মোটা টাকা ব্যয় করতেন। সেকালের বহু সংগ্রহ দাতব্যসূত্রে এখন নানা জাতীয় সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। এই বিষয়ের শিক্ষার্থীরা সেই সব সংগ্রহ অবসরমতো পরীক্ষা করতে পারেন। আমি নিজেও একজন সংগ্রাহক, যদিও বড় দরের নয়। খোলক সম্পর্কে প্রকৃতির কারুকলা বিষয়ে আমার বিস্ময় ও অনুরাগ আমার শ্রোতাদের কারও কারও মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারলে খুশি হ'ব। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো দেখবেন খোলক সম্পর্কে অনুরাগ জন্মালে তা নিতান্ত নিরর্থক হবে না, বেশ কিছু আনন্দও পাওয়া যাবে। সঙ্গী হিসাবে খোলক হয়তো কিছু অদ্ভুত, কিন্তু সাপের চেয়ে অদ্ভুত বা বিরক্তিকর নয়। আমি শুনলাম এই পর্যায়ে সাপ সম্বন্ধে একটি আলোচনা কিছুদিন আগে হয়ে গেছে।

আপনারা যখন কোন মৃত খোলক দেখতে পাবেন তখন মনে করবেন যে এক-কালে একটি প্রাণচঞ্চল জীব এর বাসিন্দা ছিল। জীবনসংগ্রামের অংশস্বরূপ নিজের চারদিকে এটিকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল সে একাধারে বাসস্থান এবং আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে। বাসিন্দার বৃদ্ধিলাভের সঙ্গে এই গৃহ বড় হয়েছে এবং তার পূর্ণ পরিণতির সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে। এমনিতেই যা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক, সেই খোলক-চর্চার মনোহারিতা দ্বিগুণ বেড়ে যায় যখন আমরা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করে অনুধাবন করি যে আমাদের আলোচ্য বিষয় পৃথিবীর প্রাণিকুলের প্রাচীনতম নিদর্শনের অন্যতম। প্রাণীটি অবশ্য খুবই নিম্নস্তরের সন্দেহ নেই, কিন্তু তাৎপর্যে গভীর এবং ঔৎসুক্য-উৎপাদক। খোলকের আকার, আয়তন, স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের সীমা নেই। এই বিষয়ে আগ্রহ এবং রহস্য আরও গভীর হয় যখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সামান্য কম্বোজ কেন এবং কি ভাবে নিজের জন্য অনন্যসুন্দর আবরণ গড়ে তোলে।

খোলক সম্বন্ধে অনুরাগ জন্মালে আপনারা অল্পদিনেই আবিষ্কার করবেন যে স্থলচর, মিঠা জলের অধিবাসী এবং সামুদ্রিক কম্বোজের প্রকারভেদ এত বেশী যে বিশ্বাস করা কঠিন। বস্তুত, বিজ্ঞানীরা এক লক্ষেরও বেশী প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। অতি ছোট আণুবীক্ষণিক জীব থেকে আধ টন ওজনের ক্ল্যাম পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ক্ল্যামের খোলক এত বড় যে তা স্নান করবার টব হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বর্ণ ও আকৃতি-বৈচিত্র্যের যে প্রচুর সমারোহ কম্বোজ-খোলকে মেলে জীবজগতের অন্যত্র তা মেলে না। ফলে খোলক-সংগ্রহ এক সাহসিক অভিযান বলে মনে হয়। কম্বোজ কেবল সমুদ্রের অধিবাসী নয় ; হ্রদ, নদী ও পুষ্করিণীতেও

প্রচুর কম্বোজ মেলে, যদিও সামুদ্রিক কম্বোজের তুলনায় এদের বৈচিত্র্য কিছু কম হ'তে পারে। এ ছাড়া, বাতাস থেকে শ্বাস নেয় এমন জাতের কম্বোজও বহু আছে; এরা বাস করে ডাঙার। ঝোপে-ঝাড়ে, গাছে, বাগানের মধ্যে—এক কথায় নানা বিভিন্ন অবস্থায় এদের সন্ধান পাওয়া যায়। যে-কোন অঞ্চলে, সমুদ্রতীরবর্তী হ'ক বা না হ'ক, সামান্য অনুসন্ধান করলেই এত বিভিন্ন জাতের খোলকী মেলে যে এই জাতীয় জীবের সংখ্যায় বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। অনুরাগী পর্যবেক্ষকমাত্রেই, যেখানেই তিনি বাস করুন না কেন, এত বিভিন্ন প্রকার খোলকী প্রাণীর সন্ধান পাবেন যে, খোলক সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান তাঁর পক্ষে সত্যিই উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রাণিবিজ্ঞানীরা কম্বোজদের পাঁচটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে বিশেষ করে দুটি, গ্যাস্ট্রোপড ও ল্যামেলিব্রাংক, সংখ্যায় এবং বৈশিষ্ট্যে প্রধান। গ্যাস্ট্রোপডের খোলক অখণ্ড; ল্যামেলিব্রাংকের খোলক দ্বিবিভক্ত—অংশ দুটি যেন কব্জা দিয়ে জোড়া। যে-সব খোলক সচরাচর দেখা যায় এবং অর্থার্জনের দিক থেকে যে-গুলো মূল্যবান, যেমন শঙ্খ, টারবো, ট্রকাস, হেলিওটিস প্রভৃতি, গ্যাস্ট্রোপড শ্রেণীর অন্তর্গত। তথাকথিত মুক্তাবাহী শুক্তি, ক্ল্যাম ও মিঠা জলের মাসেল পড়ে ল্যামেলিব্রাংক শ্রেণীতে। অক্টোপাস, স্কুইড, কাট্‌লফিশ, প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন জীব তৃতীয় একটি শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর একটি জীব হ'ল নটিলাস যার বিচিত্রসুন্দর খোলক মৌক্তিক দিয়ে তৈরি।

আপনাদের মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে সামুদ্রিক খোলক স্তূপীকৃত করে তা পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়। এ থেকে আপনাদের মনে পড়বে যে, খোলকের প্রধান উপাদান হ'ল সাধারণ খড়ি বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট, যা পোড়ালে পাথুরে চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড হয়। খোলকের যা প্রধান উপাদান খড়িমাটি, কম্বোজের দেহপ্রান্ত-নিঃসৃত রস জমে জমে তা গড়ে ওঠে। এর সঙ্গে মিশে থাকে অল্প পরিমাণে সিরিশের মতো জৈব পদার্থ যা অজৈব খড়িমাটিকে সংবদ্ধ রাখে এবং তার যান্ত্রিক দৃঢ়তা সম্পাদন করে। খোলকের আকার বহু ক্ষেত্রে এমন যে মনে হয় যেন এর যান্ত্রিক দৃঢ়তা সম্পাদন এবং আঘাত প্রতিরোধ করে অক্ষত থাকবার জন্য তা হিসেব করে তৈরি হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে আকস্মিকভাবে চিড় খেয়ে গেলে খোলক সেই ক্ষত নতুন নিস্রাব দিয়ে মেরামত করতে পারে। স্পষ্ট ভাঙা জায়গা মেরামত হয়েছে এমন একটি নটিলাসের খোলক আমি নিজেই দেখেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে খোলক নির্মাণের উপাদান সংগ্রহে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কম্বোজ-কুল যে অংশ গ্রহণ করে, প্রকৃতির সামঞ্জস্য-ব্যবস্থায় তার স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীতে খড়িমাটির যে-সব সঞ্চয় দেখা যায় সেগুলো যে বহুকাল ধরে জলের তলায় জমা হওয়া খোলকী জীবের সূক্ষ্ম দেহাবশেষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খোলকের খড়িমাটির উপাদানের বাহ্যিক রূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হয়, যেমন দেখা যায় আমাদের পরিচিত শঙ্খের বেলায় তা চীনামাটির মতো শ্বেত ও কঠিন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এর আকৃতি ঘষা কাচের মতো বর্ণহীন এবং

ঈষদচ্ছ—যেমন দেখা যায় বহুখ্যাত শার্সিওয়ালা কস্তুরায়। অপর ক্ষেত্রে খোলকের পুরু অংশ, অন্তত তার অধিকাংশ, চমৎকার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা-সমন্বিত মৌক্তিক দিয়ে তৈরি। সৌন্দর্য এবং যান্ত্রিক দৃঢ়তার জন্য মৌক্তিক বহু শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং পণ্য হিসাবে তার মূল্যও যথেষ্ট। যে জিনিসটি মূলত প্রায় নির্ভেজাল খড়িমাটি তার বাহ্য রূপে এত পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান হয়েছে। এ বিষয়ে যা জানা গেছে তার কিছু আলোচনা করছি।

স্বাভাবিক অবস্থায় খড়িমাটি একটি কেলাসিত পদার্থ। এক টুকরো দানাদার চুনাপাথর পরীক্ষা করলেই এ সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহের নিরসন হবে। রাসায়নিক দৃষ্টিতে চুনাপাথর খড়িমাটি ছাড়া আর কিছু নয়। এক খণ্ড মর্মর ভাঙলে, তার ভগ্ন স্তরে কেলাসিত আকার অনায়াসেই লক্ষ করা যায়। খোলকের গায়ে যখন খড়ির আস্তরণ পড়ে, তখন সিরিশজাতীয় পদার্থের উপস্থিতি বৃহদাকার কেলাস গঠনে খড়ির স্বাভাবিক প্রবণতাকে বাধা দেয়। কিন্তু কেলাস ঠিকই গঠিত হয়। কেলাসগুলির আকার যত বড় হবে এবং তাদের বিন্যাস যত সুষম হবে, খোলক-উপাদানের অচ্ছতা-প্রবণতা ততই বাড়বে। শার্সিওয়ালা কস্তুরায় ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে; এতে কেলাসের আকার যথেষ্ট বড় এবং বিন্যাসের সমতা সমধিক। এর খোলকের উপাদান প্রায় অচ্ছ; এমন কি কোন কোন দেশে বাস্তবিকই জানালার শার্সি দেওয়া হয় এই বস্তু দিয়ে।

এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, খড়িমাটির দুটি পৃথক কেলাসিত রূপ জানা আছে। বাহ্যিক রূপ ভিন্ন হলেও রাসায়নিক বিচারে এরা অভিন্ন। এদের একটি ক্যালসাইট ও অপরটি আরাগনাইট। প্রাকৃতিক অবস্থায় ক্যালসাইট রূপই বেশী দেখা যায়। সব কম্বোজ-খোলকে এই রূপই বর্তমান, অবশ্য যে-অংশ মৌক্তিকের মতো উজ্জ্বল সে-অংশ ছাড়া। খড়িমাটির বিরলতর প্রকার আরাগনাইটের সূক্ষ্ম কেলাস দিয়ে মৌক্তিক গঠিত। সিরিশজাতীয় পদার্থে প্রোথিত এই কেলাসগুলি খোলকগাত্রের প্রায় সমান্তরাল স্তরসমূহে বিন্যস্ত। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে এক ইঞ্চি পুরু অংশে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার এইরকম স্তর থাকতে পারে। মৌক্তিকে যে অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণচ্ছটা দেখা যায়, এই বিশিষ্ট গঠনই তার হেতু। মৌক্তিকের যান্ত্রিক দৃঢ়তার মূলে সিরিশজাতীয় পদার্থের উপস্থিতি এবং তার জন্যই মৌক্তিক কুঁদযন্ত্রে কাটা যায়। এই পদার্থ মৌক্তিককে যথেষ্ট রাসায়নিক প্রতিরোধ-ক্ষমতাও দিয়েছে। সাধারণ খড়িমাটি মৃদু লবণাম্লে অতি সহজেই গলে যায়, কিন্তু মৌক্তিকের উপর এই অম্লের ক্রিয়া নিতান্তই মন্থর। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করা যায়। সাঁচ্চা মুক্তো ও মৌক্তিকের গঠনে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; এই মাত্র প্রভেদ যে মুক্তোর স্তরগুলি সমকেন্দ্রিক গোলীয়, মৌক্তিকের মতো সমতল নয়। সুতরাং, মুক্তো আসলে অল্প মাত্রায় সিরিশজাতীয় পদার্থ-মিশ্রিত খড়িমাটি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা বলে অবশ্য মুক্তার সৌন্দর্য বা মূল্যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি, যেমন হীরা ও কয়লা একই বস্তু হওয়া সত্ত্বেও হীরার মর্যাদা অক্ষুণ্ণই আছে।

খোলকের জ্যামিতিক রূপ এবং বহিরংশের তক্ষণ প্রায়ই আশ্চর্যরূপে সুন্দর। কম্বোজের জীবনে খোলকের এই আকার ও সৌন্দর্যের কোন মূল্য আছে কি না অথবা বিচিত্র জীবকুল সৃষ্টি করে তাদের সুষমা-মণ্ডিত করায় প্রকৃতির এটি লীলামাত্র, সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করার সাহস আমার নেই। কারণ আমি বৃত্তিগত প্রাণিবিজ্ঞানী নই। খোলকে যে আশ্চর্য রঙের খেলা প্রায়ই দেখা যায় সে বিষয়েও আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ বিষয়টি আমি অনুধাবন করি নি। একটি ব্যাপারে কিন্তু কোন সন্দেহ নেই : বাহ্যিক আকারের সঙ্গে আভ্যন্তর গঠনবিন্যাসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত, ল্যামেলিব্রাংক, গ্যাস্ট্রোপড বা নটিলাস থেকে প্রাপ্ত মৌক্তিক অণু-বীক্ষণে পরীক্ষা করলে দেখা যায় প্রত্যেকটির গঠনে মূলগত প্রভেদ বর্তমান। ব্যাপারটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হয় এবং অনুমান করা যায় যে খোলক-উপাদানের ব্যাপকতর পর্যালোচনা কম্বোজের শ্রেণীবিভাগ নিরূপণে পথনির্দেশ করতে পারে।

৪। প্রকৃতির জ্যামিতি

সৌন্দর্যের স্বরূপ কি, কোন বিশ্লেষণে তার কূল পাওয়া যায় না। মাত্র অবয়বের দিক থেকে আমরা সৌন্দর্যের কয়েকটি উপাদান নিরূপণ করতে পারি যাদের মধ্যে প্রতিসাম্য ও অনুপাতের মতো কয়েকটির বৈশিষ্ট্য জ্যামিতিক। বিভিন্ন জীবের অবয়ব লক্ষ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনেকখানি নিহিত রয়েছে জ্যামিতিক গুণাবলীর মধ্যে। সৌন্দর্যের এই বহিরংগ বা জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের একটি অপরিহার্য লক্ষণ—দক্ষিণের সংগে বামের প্রতিসাম্য—অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। ভিন্ন ধরনের উচ্চতর প্রতিসাম্যের নানা ভংগি দেখা যায় উদ্ভিদজগতে ; পাতা ও ফুলের বাহারূপের মূলে আছে এই সব প্রতিসাম্য। উদ্ভিদ বা প্রাণী যাই হ'ক, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের মধ্যেও প্রতিসম গঠনের অসংখ্য প্রকার উদাহরণ অণুবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ করা যায়। মিঠা জলের বা সামুদ্রিক কম্বোজের মতো নিম্নশ্রেণীর প্রাণিকুল পর্যবেক্ষণ করলে জ্যামিতিক আকারের অজস্র সম্ভারের সন্ধান মেলে। কেবলমাত্র প্রতিসাম্যের ছন্দ রচনা করেই কিন্তু প্রকৃতির কারুকলা নিঃশেষিত হয় নি। যেমন, অরণ্যবিশেষের শোভা মাত্র তার পত্রপুষ্পের রূপে নিবদ্ধ নয়—তা যত সুদৃশ্যই হ'ক না কেন। জ্যামিতিক আকারের আর যে-সব অংগ দর্শকের চোখ এবং মনকে মুগ্ধ করে তার মধ্যে আছে বৃক্ষের সরল সুদীর্ঘ কাণ্ড, বিস্তারিত পত্র-বহুল শীর্ষ এবং শাখায় শাখায় নিবিড় কোলাকুলি।

প্রকৃতির এই সৃজনী-প্রচেষ্টার প্রণিধান ও ব্যাখ্যা দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমে আমরা জীববৈজ্ঞানিক দিক অর্থাৎ জীবনের ক্রিয়ার সুষ্ঠু সম্পাদন সম্পর্কে বিবেচনা করতে পারি। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের কার্যকলাপ তার আকৃতি ও গঠনের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং জীবের গঠনবিন্যাসের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের অবশ্যই জীববৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জলে, স্থলে ও আকাশে সঞ্চরণশীল প্রায় সব প্রাণীর মধ্যে যে বাম ও দক্ষিণের প্রতিসাম্য দেখা যায় তার উদ্দেশ্য প্রাণীর গতির সহায়তা করা। অপর পক্ষে, কম্বোজের বেলায় দেখা যায়, তারা প্রায়ই কোন দৃঢ় বস্তুর সংগে নিজেদের সংলগ্ন রাখে ; তাদের মধ্যে এই প্রতিসাম্য নেই, বরং দেহকে সংলগ্ন রাখার উপযোগী অন্য ব্যবস্থা আছে। সুতরাং নিরাপদে এই সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় ঃ জ্যামিতিক আকৃতির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করে।

অপর দৃষ্টিকোণ পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদের। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়, সংগঠনের উপাদানের সংগে তার জ্যামিতিক আকারের সম্পর্ক অনুসন্ধান। জীবদেহ গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয় উপাদানের নির্বাচনে প্রাণশক্তির খানিকটা স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতা কিন্তু নিরংকুশ নয়, নির্বাচিত পদার্থ পাওয়া না-পাওয়ার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। প্রোটীন নামধেয় জটিল জৈব পদার্থ জীবনের

আধারস্বরূপ। কিন্তু এই বস্তু এত স্পর্শকাতর ও সহজে ধ্বংসশীল যে তা কয়েকটি নিতান্ত সীমাবদ্ধ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কঠিন সংগঠন নির্মাণের উপযোগী উপাদান নয়। সুতরাং জীবদেহের যে দৃঢ় কাঠামোর উপর প্রাণের ভিত্তি গঠিত হয় তা মেলে অজৈব পদার্থে—যথা, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। কোন প্রাণীর জ্যামিতিক আকারের নির্দেশক অন্যতম প্রধান হেতু এই সব পদার্থের প্রকৃতি ও ধর্ম এবং প্রোটীনের সঙ্গে তাদের সংযোগ-সম্পর্ক। রোমন্থক প্রাণীদের শৃঙ্গ এবং স্তন্যপায়ীদের কেশ ও দেহলোমের মতো দ্রুত বর্ধনশীল কয়েক প্রকার সংগঠন নির্মাণে প্রোটীন জাতীয় বস্তু বিশেষভাবে সমর্থ। স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ রেশম-সদৃশ কেশের দীর্ঘ তন্তুবৎ জ্যামিতিক আকারের মূলে আছে এক জাতীয় প্রোটীন-অণুর বিশিষ্ট গঠন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মানবের কেশ-সৌন্দর্য প্রকৃতির প্রোটীন-রাসায়নিক ক্রিয়ার একটি বিশেষ প্রকাশ।

এখানে বহিরঙ্গ ও উপাদানের আভ্যন্তর গঠনবিন্যাসের ঘনিষ্ঠতার একটি উদাহরণের উল্লেখ করতে চাই। মৌক্তিকের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে অনুসন্ধানকালে বিষয়টি আমি সম্প্রতি লক্ষ করি। একথা জানা আছে যে, কম্বোজদের এমন কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যাদের প্রত্যেকটির আকার ভিন্ন। আলোক এবং এক্স-রশ্মি পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থেকে পাওয়া মৌক্তিকের আভ্যন্তর গঠন সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্য বিশেষভাবে দেখা যায়, মৌক্তিকের যা প্রধান উপাদান সেই আরাগনাইট আকারে কেলাসিত খড়িমাটির সূক্ষ্ম কেলাসগুলির বিতরণ ও বিন্যাসে। এই পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য এমনই যে উপাদানের আভ্যন্তর গঠনবিন্যাস দ্বারাই যে বিভিন্ন গড়নের খোলকের আকার নিয়ন্ত্রিত হয়, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

উদ্ভিদজগতের জ্যামিতিক রূপ বহুলাংশে নিরূপিত হয় সেলুলোজ নামক বিচিত্র রাসায়নিক পদার্থের ধর্ম দ্বারা। বস্তুটি কার্বন, অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগিক। গুণাবলীতে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও শর্করার সঙ্গে সেলুলোজের গঠনে বেশ কিছু মিল আছে। শর্করা জলে দ্রবণীয় কিন্তু সেলুলোজ নয়। সেলুলোজ-অণুর গঠন এমন যে তারা সহজেই স্তবক বা মাইসেল রচনা করতে পারে এবং স্তবকগুলো জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ তন্তু নির্মাণ করতে পারে। উদ্ভিদের কাষ্ঠময় কঙ্কাল তৈরি হয় লিগ্‌নিন নামে অনিবন্ধী দ্রব্য দ্বারা সংযুক্ত সেলুলোজ তন্তুর সমবায়ে। সুতরাং আমরা যখন কোন অরণ্যের মহীরুহসমূহের দীর্ঘ কান্ড এবং শাখাপ্রশাখা ও পত্রজালের ছন্দে মুগ্ধ হই, তখন মনে রাখা প্রয়োজন যে এই শোভার মূলে বর্তমান সেলুলোজ-অণুর জ্যামিতিক গুণ।

আমি গোড়াতেই জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদের জ্যামিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, কারণ বিষয়টি আমাদের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে। এই আলোচনার অপরিহার্য ফল হিসাবে জীবন্ত পদার্থের গঠন এবং জৈব ব্যাপারে আবশ্যক জটিল রাসায়নিক-সমূহের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করতে হয়েছে। এখানে কিন্তু এ কথা বলা প্রয়োজন যে বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়ে আমরা যতটুকু জানি, তার চেয়ে পদার্থের

মৌলিক কণিকা অর্থাৎ অণু-পরমাণুর জ্যামিতিক আকার সম্পর্কে অনেক বেশী জানি, যদিও এই সব কণিকা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করবার কোন উপায় নেই। গত বিশ বছরে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষণমূলক পদার্থবিজ্ঞানে যে সবিশেষ অগ্রগমন ঘটেছে তা থেকে আমরা পরমাণু এবং বহু অণুর জ্যামিতিক বিন্যাস সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেছি। তত্ত্ব এবং পরীক্ষণ—দুই বিচারেই বোঝা যায়, পরমাণু একটি আহিত কেন্দ্রকের চতুর্দিকে বিশিষ্ট জ্যামিতিক ছকে সজ্জিত ইলেকট্রন-মণ্ডলী দিয়ে গঠিত। পরমাণুর সংযোগে অণুর গঠনও নির্দিষ্ট জ্যামিতিক সূত্রের অধীন। পদার্থবিজ্ঞানে এমন কয়েকটি উপায় আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে যদ্দারা অণুর আকার এবং বিন্যাসের প্রতিসাম্য সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপিত এবং বিবৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি যে বহু জটিল রাসায়নিকের প্রারম্ভ বেন্‌জিন-এর অণু আকারে ও গঠনে নির্দোষ ষট্‌কোণ।

পদার্থের কেলাসিত রূপের পরীক্ষণে লব্ধ প্রাকৃতিক জ্ঞানের সঙ্গে জ্যামিতির ঘনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক সম্পর্কের কথা এতক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রেখেছি। ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা পরিদর্শনকালে স্বাভাবিক কেলাসের অনেকগুলি চমৎকার নিদর্শন আপনারা দেখতে পাবেন। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ—হীরকের অষ্টতলক, কোয়ার্টজের ষট্‌কোণ স্তম্ভ, খনিজ লবণের ঘনক, ক্যাল্‌ক্‌স্পারের রম্বোহিড্রন, গার্নেটের দ্বাদশতলক এবং অভ্রের বৃহৎ প্রিজমীয় পাত। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিজাত বা মনুষ্যরচিত অধিকাংশ কঠিন বস্তুই কেলাসিত, যদিও বাইরের আকার থেকে তা সর্বদা বোঝা যায় না। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে কেলাসের আভ্যন্তর গঠন হ'ল ত্রিধাবিস্তৃত স্থানে অণু বা পরমাণুর সজ্জা, সারির পর সারি, স্তম্ভের পর স্তম্ভ, স্তরের পর স্তর, সমদূরে এবং সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে গ্রথিত। পদার্থের মূল-কণিকার নিয়ত বিন্যাসের সম্ভাব্য প্রকারসংখ্যা নিরূপণে এবং কেলাসের শ্রেণীবিভাগে —তা বাহ্যিক প্রতিসাম্যমূলক হ'ক অথবা কণিকাগুলির আভ্যন্তর বিন্যাসজনিত হ'ক —জ্যামিতিক তত্ত্ব বিশেষ সহায়ক। এই ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক কিন্তু বিজ্ঞানীদের পক্ষে নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক যে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক বিচারে প্রাপ্ত কেলাসের সম্ভাব্য শ্রেণীসংখ্যা ৩২ এবং কণিকার আভ্যন্তর বিন্যাস সংখ্যা ২৩০-এর সঙ্গে, কঠিন অবস্থার পরীক্ষাকালে লব্ধ কঠিন বস্তুতে প্রাপ্ত কেলাসের শ্রেণীসংখ্যা ও পারমাণবিক বিন্যাসের সংখ্যা হুবহু মিলে যায়।

৫। প্রকৃতিতে আলোক ও বর্ণ

প্রকৃতির যে মুখ আমরা দেখতে পাই তার বৈচিত্র্য অনন্ত। প্রকৃতিপ্রেমিকের কাছে তা সততই শোভিনী ও মনোহারিণী। আকাশের নীলিমা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মহিমা, পলাতক মেঘের ক্ষণচঞ্চল রূপ, অরণ্য ও প্রান্তরের বিচিত্র বর্ণ-সুষমা, নিশীথরাত্রের নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল—আরও যে-সব দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সে-সবই আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকৃতিদেবী বর্ণ ও আলোকের যে অন্তহীন নাটকের অবতারণা করেছেন তার অঙ্গ। বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেন জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে, কিন্তু তাই বলে প্রকৃতির রূপলীলা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। বরং সঠিক বিচারে এই কথাই বলতে হয় যে এই জ্ঞানই আমাদের দৃষ্টিকে মার্জিত করে এবং সুন্দর ও অসামান্যের উপলব্ধিকে গভীরতর করে। বারে বারে এমন ব্যাপারও ঘটতে দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যালোচনা নব নব জ্ঞানলাভের সুদূরপ্রসারী পথ খুলে দিয়েছে। যেমন, বস্তুর মধ্য দিয়ে চালিত হ'লে তড়িতের আলোক-সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মায়, প্রকৃতি দেবীর কল্যাণে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখা যায় বজ্রঝটিকার সময়ে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আমাদের তড়িৎ-শিল্প সেই শক্তিকেই নানা উপায়ে বশীভূত করে মানব-কল্যাণে নিয়োগ করেছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে আমরা বিভিন্ন ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ণের অসংখ্য আলোকবিন্দু দেখতে পাই, যাদের আমরা তারা বা নক্ষত্র বলি। বর্ণালীবীক্ষণ সাহায্যে নক্ষত্রালোক বিশ্লেষণ, সূর্যালোক ও নক্ষত্রালোকের বর্ণালীর মোটামুটি সাদৃশ্য, বর্ণ ও পরম ঔজ্জ্বল্য বিষয়ে তাদের বর্ণালীর সূক্ষ্ম ভেদ, প্রভৃতি থেকেই ধরা পড়েছে সূর্যের নাক্ষত্র প্রকৃতি—বা নক্ষত্রের সৌর প্রকৃতি—এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশের মূলগত ঐক্য ও নক্ষত্রের বিবর্তনের ধারা।

প্রকৃতিতে যে-সব পরিচিত বস্তু দেখি তার বর্ণের আদি কি, বিজ্ঞানীদের কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার একটি বিষয়। উদাহরণ হিসাবে, পরস্পর সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ সমস্যার আলোচনা করা যাক।

একটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার—কোন বস্তুর বর্ণ বলতে কি বোঝায়? বর্ণ কি বস্তুটির বহির্গাত্র থেকে প্রতিফলিত আলোর রঙ, বস্তুটির অভ্যন্তর ভেদ করে বাইরে থেকে যে আলো আসছে তার রঙ, না যে আলো বস্তুটির অভ্যন্তরে বিচ্ছুরিত হবার পর বাইরে আসে তার রঙ? প্রথম দৃষ্টিতে যা সরল বলেই মনে হয় এমন একটি সমস্যা সম্পর্কে এতগুলো প্রশ্নের অবতারণা কিছু বিস্ময়ের উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে বর্ণের যে তিনটি পরিচয় দেওয়া হ'ল সেই সেই বিচারে একই বস্তুর রঙ একেবারেই আলাদা আলাদা। জলের রঙ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে জলের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত আলোর রঙ আপাতিত আলোকের

বর্ণানুগ হবে। সুতরাং, সূর্যের আলো যখন জলের উপর পড়ে, তখন প্রতিফলিত আলোর রঙ সূর্যালোকের মতোই হবে। সূর্যের সাদা আলো যখন জলের একটি স্তম্ভ ভেদ করে নির্গত হয়, তখন সূর্যবর্ণালীর বিভিন্ন অংশের আলোক জল কি ভাবে শোষণ করে, তার উপর সেই নির্গত আলোকের বর্ণ নির্ভর করবে। বাস্তবিক দেখা যায় যে বিশুদ্ধতম জলও সূক্ষ্ম অথচ লক্ষণীয়ভাবে বর্ণালীর লোহিত ও পীত রশ্মি শোষণ করে। সুতরাং, সূর্যালোক জলের দীর্ঘ স্তম্ভ ভেদ করে নির্গত হ'লে জলের বর্ণ স্পষ্ট হরিদাভ মনে হবে। আবার আলো যখন জলের মধ্য দিয়ে যায় তখন আলোর কিছু বিচ্ছুরণ ঘটে। বিচ্ছুরণ ঘটায়, এক: জলে ব্যাপ্ত কণিকাগুলো এবং দুই: স্বয়ং জলের অণুগুলো। ব্যাপ্ত কণিকার সংখ্যা যদি অল্প হয় অর্থাৎ তাদের ক্রিয়া যদি ধর্তব্যের মধ্যে না হয়, তাহ'লে বিচ্ছুরণ ঘটাবে প্রধানত জলের অণুগুলো; সেক্ষেত্রে বিচ্ছুরিত আলোর রঙ হবে আসমানী।

অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোন বিশেষ অবস্থায় দৃষ্ট জলের রঙ অনেকগুলি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। যথা, পৃষ্ঠ থেকে কি পরিমাণ আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে, জলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বর্ণালীর লোহিত ও পীত রশ্মি কতখানি শোষিত হচ্ছে এবং সর্বশেষ, জলের মধ্যে আলোক-বিচ্ছুরণ কি ভাবে হচ্ছে। সুতরাং অতি পরিষ্কার জলের প্রতীয়মান বর্ণ যে পর্যবেক্ষণের অবস্থার উপর নির্ভর করবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যদি পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলনের ব্যাপার বাদ দিতে পারা যায়—যেমন সোজা নিচের দিকে তাকালে হ'তে পারে—তাহলে যথেষ্ট গভীর এবং নির্মল হ'লে জলের বর্ণ নির্ণীত হবে আণবিক শোষণ ও বিচ্ছুরণের যুক্ত ক্রিয়ার দ্বারা। এ ক্ষেত্রে জলের রঙ দেখাবে গাঢ় নীল, যার গাঢ়ত্ব আকাশের নীলিমার চেয়ে অনেক গভীর। আবার, জলের গভীরতা যখন অপেক্ষাকৃত কম, যেমন জল যখন মথিত বা বুদ্বুদপূর্ণ অথবা জলের আধারই অগভীর, তখন বিচ্ছুরণের ক্রিয়া উপেক্ষা করা চলে এবং জলের রঙ হরিৎ বা হরিদাভ নীল দেখায়।

জলের রঙ নিয়ে এই বিশদ আলোচনার কারণ বিষয়টির মূল সূত্রগুলির উপস্থাপন এবং একথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া যে কোন বস্তু নিজে বর্ণহীন হয়েও নানা উজ্জ্বল রঙ প্রতিভাত করতে পারে, অর্থাৎ তার মধ্যে চালিত আলোকের বর্ণালীর কোন অংশ লক্ষণীয়ভাবে শোষিত হয় না। সৌর বর্ণালীর হ্রস্বতর তরঙ্গ কণিকা বা অণু দ্বারা বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত হ'লে বিচিত্র বর্ণসমারোহের যে প্রকাশ হয়, তার উদাহরণ নভোনীল এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে আকাশ ও মেঘের বর্ণাঢ্যতা। বিচ্ছুরিত আলোর রঙ নীল; যে অংশ বিচ্ছুরণের ক্রিয়ার আওতায় পড়ে না তা নির্ণীত হয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ দ্বারা, সুতরাং তা হবে পীত, নারাঙ্গি বা লাল, অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত সূর্যাস্তকালীন বর্ণসমারোহ।

কোন বহির্দৃশ্যের রূপ, বিশেষত তার দূরতর অংশের প্রতিচ্ছবি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আলোক-বিচ্ছুরণের উপর অনেকখানি নির্ভর করে—সেই বিচ্ছুরণ বাতাসের অণু, ব্যাপ্ত ধূলিকণা বা কুহেলির জলকণিকা, যার দ্বারাই হ'ক। যে

আলো আমাদের চোখে এসে পেঁছায় তার আশ্চর্যরকম বৃহৎ অংশ দূরস্থ দৃষ্ট বস্তু থেকে না এসে, আসে মধ্যবর্তী বায়ুমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে। এই বিচ্ছুরিত আলো অপনীত করতে পারলে দূরের জিনিস অনেক স্পষ্ট দেখা যায়। চোখের সামনে একটি নিকল বা সমবর্তক ধরে এই কাজ করা যায়। এই যন্ত্র বিচ্ছুরিত আলোকের অনেকখানি হ্রাস করে, সুতরাং দূরের জিনিস স্পষ্টতরভাবে দেখা যায়। এই কাজ আরও ভালভাবে হয় চোখের বা ফোটোগ্রাফ তোলবার ক্যামেরার সামনে গাঢ় লাল বা তথাকথিত ঊনলোহিত আলোক-ফিল্টার রাখলে। দূরের দৃশ্যের স্পষ্টতা যে এইভাবে আশ্চর্যরকম বাড়ান যায় তা সকলেরই জানা আছে।

হিমবাহ ও হিমশৈলের মতো পরিষ্কার বরফের বড় বড় চাঁইয়ের রঙ মোটামুটি-ভাবে জলের রঙের অনুরূপ। বেধশালায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পরিষ্কার বরফের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হয় এবং আলোকরশ্মির পথ আসমানী দেখায়। বর্ণালীর লোহিত ও পীত রশ্মি বিশেষভাবে শোষণ করবার যে গুণ নির্মল জলের আছে, বরফেও সম্ভবত তা বর্তমান। গভীরতা ও অচ্ছতার পরিমাণ অনুসারে, শোষণ ও বিচ্ছুরণের মিলিত ক্রিয়ায় বরফের রঙ হালকা সবুজ থেকে গাঢ় নীল পর্যন্ত নানা বর্ণের হয়ে থাকে।

৬। আলোক ও বর্ণের অনুভূতি

আমাদের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে চেতনা লাভের যে-সব উপায় প্রকৃতিদেবী আমাদের দিয়েছেন, তার মধ্যে আলোক ও বর্ণের অনুভূতি সর্বাগ্রগণ্য। আমাদের পরিবেশকে যারা আলোকিত করে, রাতের আকাশের নক্ষত্ররাজি ও দিনে সূর্য সেই সব শক্তির উৎস। মানুষ কিন্তু এই সব প্রাকৃতিক আলোকের উৎসে সন্তুষ্ট থাকে নি; নানা উদ্ভাবনী-কৌশল প্রয়োগ করে রাতকে দিন বানাবার চেষ্টা করেছে। আমাদের পরিবেশকে দৃষ্টিগোচর করা ছাড়া সৌর কিরণ আমাদের জীবনে আরও অনেক প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে; কিন্তু সে বিষয়ে আমি এখন আলোচনা করব না। মোটেই আশ্চর্য নয় যে সূর্য থেকে বিকীর্ণ প্রচণ্ড শক্তি মানুষের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে আসছে; ফলে সূর্য মানুষের আরাধনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কোথায়, এই জিজ্ঞাসা স্বভাবতই বিজ্ঞানের জটিল সমস্যাগুলির অন্যতম।

আলোকের স্বরূপ উপলব্ধির প্রথম বাস্তব উপায় বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আলোকের বিশ্লেষণ। এই যন্ত্র সূর্যের আলো-কে নানা রঙে রঙিন পটিতে বিস্তৃত করে দেয়। বহুসংখ্যক কাল রেখা এই পটিকে ছেদ করে যায়। এই পটি বা বর্ণালীর রঙ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমাগত বদলে যায়। বিশেষভাবে শিক্ষিত দৃষ্টিতে সৌর বর্ণালীর বেগুনি প্রান্ত থেকে লাল প্রান্ত পর্যন্ত পঞ্চাশটি পৃথক রঙ সহজেই ধরা পড়ে, এমন কি একশ'টি ধরা পড়াও আশ্চর্য নয়।

বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র সুতরাং আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, যে প্রাকৃতিক সত্তাকে আমরা সাদা আলো বলে অনুভব করি আসলে তা নানা রঙের মিশ্রণ। আলোকের প্রকৃতিগত বিশেষত্বের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে হ'লে বর্ণালীর ক্ষুদ্রতম খণ্ড—যাকে আমরা একবর্ণ আলো বলি—তার আলোচনা অত্যাবশ্যক। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, কয়েকটি গ্যাস ও ধাতব বাষ্প বৈদ্যুতিক উত্তেজনার ফলে এই ধরনের আলো বিকিরণ করে। এদেশের বড় বড় শহরে পথ আলোকনের জন্য ব্যবহৃত সোডিয়াম-বাষ্প বা পারদ-বাষ্প বাতির আলো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের বর্ণালী কয়েকটি একবর্ণ রশ্মি বা সুস্পষ্ট আলোক-রেখার সমষ্টি।

নানাবিধ ভৌত পরীক্ষা—যাদের অধিকাংশ নিতান্ত সরল—থেকে এই অনুমান করা চলে যে এক স্থান থেকে অপর স্থানে ধাবমান একবর্ণ আলো নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পনসংখ্যাবিশিষ্ট তরঙ্গগতি। শূন্য স্থানে আলোর বেগ, বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রেরিত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সমান। এইটিই যথেষ্ট প্রমাণ যে যাকে আমরা আলো বলছি তা মূলত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। দৃশ্য বর্ণালীর প্রতিটি অংশের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পৃথক, কিন্তু এই সব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেতার-সম্প্রচারে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রতম তরঙ্গের চেয়ে অনেক অনেক ছোট। সুতরাং রঙের বিভিন্নতার ভৌত ভিত্তি বর্ণালীর একবর্ণ আলোকের সংশ্লিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পনসংখ্যার বিভিন্নতা।

বর্ণালীর লাল প্রান্ত থেকে বেগুনি প্রান্ত পর্যন্ত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটি ৭,০০০ অংস্ট্রম একক থেকে কমে ৪,০০০ অংস্ট্রম একক দাঁড়ায়। এই এককের মাপ সেণ্টিমীটরের দশ কোটী ভাগ।

অতএব দেখা গেল যে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গরাজির সম্ভাব্য বিরাট পাল্লার একটি অকিঞ্চিৎকর অংশ আলোকরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগেঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় বিশাল বর্ণালীর যৎসামান্য অংশ মাত্র কেন আমরা দেখতে পাই? আমার মতে আমাদের আলোকের প্রধান উৎস সূর্যের বিকিরণ পর্যালোচনা করলে এই প্রশ্নের জবাব মিলবে। সৌর বিকিরণের প্রকৃতি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সূর্যের বর্ণালী দৃশ্য অংশের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় তরঙ্গপ্রান্ত পার হয়ে আরও খানিকটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে শোষণের ফলে এই বিস্তৃতি অবশ্য উভয় প্রান্তেই কিছু সীমিত হয়ে যায়। বর্ণালীর বিভিন্ন অংশে সৌর শক্তির বিতরণ সৌরপৃষ্ঠের কার্যকর উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। এই উষ্ণতার পরিমাণ প্রায় ৫,৫০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এই উষ্ণতায় স্থিত কোন বস্তু থেকে বিকীর্ণ তাপশক্তির একটি লেখ আঁকলে দেখা যাবে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণ দ্রুতহারে বেড়ে ৫,৫০০ অংস্ট্রম এককের কাছাকাছি সর্বোচ্চ বিন্দুতে ওঠে এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরও কমলে অত্যন্ত দ্রুত হ্রাস পায়। সমান শক্তির বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে চোখ কি ভাবে সাড়া দেয় তার একটি লেখ আঁকলে দেখা যাবে, মোটামুটি ৫,৫০০ অংস্ট্রম এককে চোখের সূক্ষ্মগ্রাহিতা সর্বাধিক। এই যে একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে চোখের সূক্ষ্মগ্রাহিতা এবং সৌর শক্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, তা আকস্মিক মনে করা কঠিন। যদি ব্যাপারটি সত্যিই আকস্মিক হয়, তাহলে এই মিল নিঃসন্দেহে খুবই আশ্চর্য। তার চেয়ে এইটে মনে করাই বরং সঙ্গততর হবে যে সুদীর্ঘকালব্যাপী জৈব বিবর্তনের ফলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি এই অবস্থা লাভ করেছে যে সৌরকরস্নাত আলোক-পরিবেশকে সবচেয়ে ভালভাবে তা কাজে লাগাতে পারে।

আমরা যে শুধু আলোক অনুভব করি তাই নয়, দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে পারি-পার্শ্বিক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সঠিক ধারণাও করতে পারি। এ ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্য যে পারিপার্শ্বিকের একটি ত্রিধাবিস্তৃত ছবি আমরা পাই এবং দূরের বা কাছের যে-কোন জিনিসে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করতে পারি। চোখের এই সব ক্ষমতা সম্ভব করেছে বীক্ষণযন্ত্র হিসাবে তার গঠন—যার ফলে চোখের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত অক্ষিপট নামক পরদার উপর সুস্পষ্ট বিম্ব উৎপন্ন হয়। ত্রিধাবিস্তৃত বস্তুর এই ঘনবীক্ষণ-ক্ষমতা এই কারণেই সম্ভব যে আমাদের চোখ দুটো এবং দুচোখের অক্ষিপটে যে বিম্ব পড়ে সেদুটো হুবহু এক নয়। একথা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে যে বহির্জগতের দুই অক্ষিপটে দুটো আলাদা ছবি পড়লেও আমরা দুটো দেখি না, বহিঃপ্রকৃতির অখণ্ড ছবিই দেখি। আমরা যে নিখুঁতভাবে দূর বা কাছের যে-কোন জিনিসে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে পারি এবং তার প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খ-

রূপে পরীক্ষা করে দেখতে পারি, তা প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, পারিপার্শ্বিকের দীপ্তির বিরাট তারতম্যের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। আমরা যখন বাইরের প্রখর সূর্যালোক থেকে স্বল্প-আলোকিত ঘরে আসি, তখন আলোর ঔজ্জ্বল্য দশলক্ষ গুণ কমে যেতে পারে। আলোর পরিমাণ হঠাৎ এইভাবে কমে যাওয়ায় চোখ হয়তো একটু বিব্রত হয়, কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষণিক ; চোখ একটু পরেই অল্প আলোয় দেখবার উপযোগী হয়ে যায়। যথেষ্ট সময় অন্ধকারে বিশ্রাম নিলে যে-সব জিনিষ আগে চোখেই পড়ে নি সেইগুলো অসহ মাত্রায় উজ্জ্বল দেখায়। অনুকূল অবস্থায় মানব-চক্ষুর সূক্ষ্ম-গ্রাহিতা সত্যিই বিস্ময়কর।

যে-জগতে অমরা বাস করি সেখানে সাদা, কাল আর ধূসর ছাড়া আর কিছু রঙ না থাকলে তা নিতান্তই নিষ্প্রভ হ'ত। রঙের তফাৎ বোঝবার ক্ষমতা আমাদের পারিপার্শ্বিককে উপভোগ করার আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে বলা হয়েছে, বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের তরংগদৈর্ঘ্য ও কম্পনসংখ্যার তারতম্যের উপর বর্ণের ভৌত ভিত্তি স্থাপিত। বর্ণের অনুভূতি বিষয়ে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই উক্তির প্রযোজ্যতা কিন্তু নিতান্তই সীমিত। কম্পনসংখ্যা বা তরংগদৈর্ঘ্যের যৎসামান্য হ্রাসবৃদ্ধি মানুষের চাক্ষুষ উপলব্ধির বিরাট পরিবর্তন কেন ঘটায়, এই প্রশ্ন যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয়। এই প্রসংগে একথাও অবাক হয়ে ভাবতে হয়, কি সেই শারীর-বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকৌশল যার সহায়তায় চোখ এই সামান্য পরিবর্তন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে পারে? আর একটি কথার বিশেষ উল্লেখ এই সম্পর্কে প্রয়োজন: বাস্তবক্ষেত্রে একবর্ণ রঙ নিয়ে আমাদের বড় একটা কারবার নেই। যে জিনিস স্পষ্ট রঙিন দেখায়, বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে—তাতে বর্ণালীর সবগুলো রঙই দেখা যেতে পারে। একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আকাশের নীল রঙ। রঙের পরিচয় যখন অনুভূতির প্রকার-ভেদ, তখন তা নির্ভর করে সাধারণ সাদা আলো ও বস্তুর বর্ণালীতে বিভিন্ন রঙের ঔজ্জ্বল্যের বিতরণের প্রভেদের উপর।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি হিসাবে বর্ণের আলোচনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক ; কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট। রঙ সম্পর্কে পর্যালোচনায় যে-সব আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করা যায়, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বর্ণালীর লাল ও সবুজ রঙ মিশিয়ে হলুদ রঙের আলোর অনুকরণ করা যায়। বর্ণালীর হলুদের সংগে শতাংশ বেগুনি মিশিয়ে সাদা আলো তৈরি করা যায়। বর্ণালীর তিনটি মূল রঙ—লাল, সবুজ এবং নীল বা বেগুনি—পরিমাণ মতো মিশিয়ে যে-কোন রঙ নকল করা সম্ভব। মূল বর্ণ হিসাবে যে-গুলো নেওয়া হবে তাদের তরংগদৈর্ঘ্য অনেকখানি অদলবদল করা চলে এবং একবর্ণ আলো না নিয়ে বর্ণালীর বেশ খানিকটা করে চওড়া অংশও নেওয়া চলে।

যে-সব ব্যাপারকে দৃষ্টিবিভ্রম বা চাক্ষুষ ভ্রান্তি বলা হয় তাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করলে আলো ও রঙের বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নানা ভাবে

আলোকিত বা রঞ্জিত বস্তু দেখবার সময় আমাদের যে-সব অনুভূতি জন্মায়, সেগুলি নির্ণয়ে এইজাতীয় ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন বর্ণের সান্নিধ্যের ফলে যে-সব ব্যাপারের উদ্ভব হয় এবং চক্ষুগ্রাহ্য সৌন্দর্যবিচারে যাদের মূল্য অনস্বীকার্য, যথা, বর্ণের বৈসাদৃশ্য, সামঞ্জস্য ও সংঘাত—এগুলো সম্পর্কেও পূর্ববর্ণিত ঘটনার গুরুত্ব যথেষ্ট।

বর্ণান্ধতা নামে যে বিশেষ অবস্থা আছে সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। কোন কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি বর্ণান্ধতায় ভোগেন; সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা রঙের যে তারতম্য অনায়াসে ধরতে পারেন সেই ক্ষমতা থেকে এঁরা বঞ্চিত। কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের কাজে বর্ণান্ধতা বিপদ ঘটাতে পারে। বর্ণান্ধতা সম্পর্কীয় অনুসন্ধান যে যথেষ্ট মনোযোগ পেয়েছে, তার একটি কারণ এই। এ বিষয়ে আগ্রহের আর একটি কারণ, এই অনুসন্ধান স্বাভাবিক বর্ণানুভূতির ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করে।

আলোতে চোখ কি ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয় সে বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম গবেষণা সম্প্রতি হয়েছে। দৃষ্টিঘটিত বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে দৃষ্টিশক্তির প্রক্রিয়া ও অনুভূতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করার প্রচেষ্টাও হয়েছে। অক্ষিপটের জ্ঞাত গঠনবিন্যাস ও অক্ষিপটে কয়েকটি রঞ্জকপদার্থের আনুমানিক উপস্থিতির উপর এই সব মতবাদ অনেকখানি নির্ভরশীল। মনে করা হয় যে রঞ্জকপদার্থগুলোয় আলো পড়লে আলোক শোষণের ফলে তাদের মধ্যে সাময়িক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। উচ্চতর প্রাণীর অক্ষিপটের দণ্ডাংশ থেকে সত্যিই 'ভিজুয়াল পার্পল' নামে এক প্রকার রঞ্জকপদার্থ নিষ্কাশিত করা যায় এবং বস্তুটির দ্রবণ তীব্র আলোয় বিরঞ্জিত হয়। দৃষ্টিবিজ্ঞানের নতুন নতুন মতবাদের অনেকগুলোর সূচনা এই ঘটনা থেকেই।

৭। বিজ্ঞান ও শিল্পে আলোক ও বর্ণ

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, সমস্ত দিনব্যাপী পরিশ্রম এবং সন্ধ্যায় পাখীর নীড়ে ফেরার মতো ঘরে ফিরে বিশ্রাম, মানবসমাজ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের একটি চমৎকার পন্ধতি হতে পরে, কিন্তু কোন অসমসাহসী একনায়কও জীবনধারণের অন্যতম নিয়ম হিসাবে এটি চালাতে সাহসী হবেন কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাঁরা পুরো বারো ঘণ্টা পরিষ্কার দিনের আলো পান, সেই সব উষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীদের জন্য এই নিয়ম চালানর কথা অন্তত কল্পনা করা যায়। যেখানে পুরো ছটি মাস সূর্যের মুখ দেখা যায় না, শুধু মেরুজ্যোতি নীরন্ধ্র অন্ধকার খানিকটা ঠেকিয়ে রাখে, সেই মেরু-প্রদেশের কথা বাদ দিলেও, উত্তরাক্ষ দেশগুলোতে এই নিয়ম একেবারেই অচল। কার্যকাল বাড়াবার জন্য—তার ফল ভাল বা মন্দ যাই হ'ক—মানুষ আলোক উৎপাদনের নানা উপায় বের করেছে। এই সব উপায়ের আদিমতম হ'ল আগুন বা জ্বলন্ত মশাল। শীতপ্রধান দেশে আলোকের অনুগামী তাপ স্বভাবতই সমাদৃত। বস্তুত, অনেকে মনে করেন, আর্য ধর্মসমূহের অন্যতম অঙ্গ অগ্নি-উপাসনা, যখন আর্যদের পূর্বপুরুষরা উত্তর দেশের তুষারমণ্ডিত মরুভূমিতে বাস করতেন তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে।

মানুষের তৈরি আলোকের আধার সূত্রে যে-সব যুগ এসেছে তাদের ক্রম নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। পিতলের তৈরি সুদৃশ্য রেড়ির তেলের প্রদীপ আমাদের সকলের অত্যন্ত পরিচিত; আজ কিন্তু সেই সব দীপ অবজ্ঞাত হয়ে কোন অন্ধকার কোণে পড়ে আছে। প্রাচীন ধারা গেছে বদলে, সেখানে এসেছে নানা নতুন, ব্যবস্থা, যেমন কেরোসিন তেলের আলো; গ্যাসের বাতি; কার্বন-তন্তু, ধাতব-তন্তু ও গ্যাসভর্তি বিজলি-বাতি; উচ্চ ও নিম্নচাপ পারদ আর্ক বাতি; নিয়ন-বাতি; সোডিয়াম-বাষ্প বাতি—এবং আরো অনেক কিছু।

আলোর কোন উৎসের উপযোগিতা বিচার করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের জামাকাপড় এবং গায়ের রঙ দিনের আলোয় এক-রকম, আবার কৃত্রিম আলোকে প্রায়ই অন্যরকম দেখায়। এটি যে সব সময়েই অসুবিধা-জনক তা নয়, নারী মাত্রেই একথা জানেন এবং কাজে লাগান। নিছক ব্যবহারিক দিক থেকে অবশ্য যে-আলো সূর্যালোকের অনুরূপ সেই আলোই সর্বোৎকৃষ্ট। আবার আরামের মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যাবে, এই কৃত্রিম আলোরও সূর্যালোকের মতোই বিচ্ছুরিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কোন ঘরে ঢুকে ঘনীভূত চড়া আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো বিরক্তিকর অবস্থা অল্পই আছে। বাতির আচ্ছাদন প্রভৃতির সাহায্যে আলোক বিচ্ছুরণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই বিরক্তিকর অবস্থা দূর করে কৃত্রিম আলোকে দিনের আলোর মতো প্রীতিকর করা। কৃত্রিম আলোয় রঙ ব্যবহারে কোন বাধা নেই, কারণ রঙের সাহায্যে আলোক-সজ্জার অনেক বাহার দেখান যায়; কিন্তু রঙ নির্বাচনে সংযম এবং কিঞ্চিৎ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে কৃত্রিম আলোকনের প্রাচীন উপায়ে একসঙ্গে তাপ এবং আলো উৎপন্ন হয়, সুতরাং অনেকটা লোকসান ঘটে। কোন বস্তুর উষ্ণতা বাড়িয়ে আমরা তাকে ভাস্বর করতে পারি। উষ্ণতা যেমন বাড়বে আলো এবং তাপের পরিমাণও তেমনিই বাড়বে, যদিও উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোকের আনুপাতিক পরিমাণ বেশী পাওয়া যাবে। আদর্শ আলো তাকেই বলব যার উৎস থেকে বিকীর্ণ সমস্ত শক্তি দৃশ্য বর্ণালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ তা হলে অবাঞ্ছিত তাপরূপে শক্তির কোন অপচয় ঘটবে না। অনেকের মতে আদর্শ দীপ হবে জোনাকির মতো, যা না কি আলো দেয় কিন্তু তাপ উৎপাদন করে না। এমন আরও অনেক প্রাণী আছে প্রকৃতিদেবী যাদের নিজেদের এবং আপনার পারিপার্শ্বিককে আলোকিত করার দীপ দিয়েছেন। সাগরের গভীর জলে এমন অনেক প্রাণীই বাস করে। এদের ভারি সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে—জীয়ন্ত দীপ। আমাদের বিজ্ঞানীরা সম্ভবত একদিন এই অতল সমুদ্রের অধিবাসী মীনজাতির সার্থক অনুকরণে সমর্থ হবেন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তৈরি অনুরূপ আলো আমাদের উপহার দেবেন। এখনই এমন রাসায়নিক ক্রিয়া একেবারে অজানা নয় যা তাপহীন আলো সৃষ্টি করতে পারে।

আদর্শ দীপের নিকটতম বাস্তব অনুকল্প মেলে আমরা যাকে সন্দীপ্তি বলি সেই ক্রিয়ার মধ্যে। বোলোনিয়া শহরের একজন সামান্য মুচি আবিষ্কার করেন যে প্রচণ্ড উত্তাপযোগে সিলখড়ি বা জীপসামকে এমন পদার্থে পরিবর্তিত করা যায় যার অন্ধকারে আলো দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। অনেকদিন মনে করা হয়েছিল এটি বিজ্ঞানের এক বিচিত্র ঘটনা। ফলে এবিষয়ে প্রচুর ঔৎসুক্যের উদ্রেক হয় এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণাও হয়। সন্দীপ্তি ব্যাপারটি কি এবং কি ভাবে তা ঘটান যায়, সে বিষয়ে অনেক তথ্য এই-সব গবেষণা থেকে জানা গেছে। কোন বস্তু শুধু মাত্র উত্তপ্ত হলে বর্ণালীর নির্দিষ্ট পাল্লার মধ্যে যতখানি আলো দেয় তার চেয়ে বেশী আলো দিলে তবেই বস্তুটি সন্দীপ্ত হয়েছে বলা হয়। নানা ভাবে সন্দীপ্তি ঘটান যায়। সব চেয়ে পরিচিত উপায় অতিবেগুনি আলোর ক্রিয়ায় দৃশ্য আলোর উৎপাদন। এই ধরনের বিকিরণের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত নীল হীরার আচরণঃ অদৃশ্য অতিবেগুনি আলোয় রাখলে তা জ্বলজ্বল করে জ্বলে। আমার কাছে এই রকম একটি হীরা আছে। অন্ধকার ঘরে এই হীরাটির উপর অতিবেগুনি আলো ফেললে তা থেকে এমন আলো বেরয় যে খবরের কাগজের খুব কাছে ধরলে তা পড়া যায়।

প্রয়োজন মতো নির্বাচিত পদার্থে সন্দীপ্তি উদ্রেকের একাধিক অন্য উপায় আছে। একটি উপায় ইলেকট্রন-প্রবাহ বা ক্যাথোড-রশ্মি দিয়ে বস্তুটিকে সংঘাত করা। অনেক ক্ষেত্রে এক্স-রশ্মির সংঘাতে অনুরূপ ক্রিয়া ঘটে। আবার তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নিঃসৃত বিকিরণের আঘাতে কোন কোন কঠিন বস্তুতে সন্দীপ্তির উদ্রেক করা যায়। এর সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত জিংক সালফাইড।

সন্দীপ্তি মোটামুটি দু'রকমের। প্রথম, উদ্দীপনের সময় যে আলোক-নির্গমন দেখা যায়—একে বলা হয় স্বপ্রভা। অপরটি, উদ্দীপন বন্ধ করার পর বস্তু

থেকে আলোক-নির্গমন—অনুপ্রভা। এই শেষোক্ত গুণের জন্যই বস্তুটি অন্ধকারে দীপ্ত হতে পারে অর্থাৎ উদ্দীপনের সময় সেটি যে শক্তি সংগ্রহ করেছিল তা ধীরে ধীরে ছাড়তে থাকে। পুনরায় উদ্দীপ্ত না হলে সকল অনুপ্রভ বস্তুই এক সময়ে আলো দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য।

গত দু'এক দশকের মধ্যে সন্দীপ্তি ব্যাপারটির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা ভাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বপ্রভ বাতির প্রচলন। এই বাতি মূলত তড়িৎ-মোক্ষণ নলিকা, যে নলের ভিতরে কোন অচ্ছ স্বপ্রভ পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে। এই প্রলেপ, তড়িৎ-মোক্ষণের ফলে জাত অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মিকে দৃশ্য আলোয় রূপান্তরিত করে। এই ধরণের বাতি এখনই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বাতির কয়েকটি অসুবিধা আছে, কিন্তু অল্প শক্তিব্যয়ে অধিক আলোক প্রদানের ক্ষমতার কারণে ভবিষ্যতের আলোকন-শিল্পে এর ব্যবহার নিশ্চয়ই অনেক বাড়বে।

ক্যাথোড-রশ্মি বা ইলেকট্রন-প্রবাহের সংঘাতে উদ্রিক্ত সন্দীপ্তির অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন ক্যাথোড-রশ্মি কম্পনলেখ, দূরেক্ষণ গ্রাহক যন্ত্র এবং ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ। এই সব যন্ত্রে ব্যবহৃত স্বপ্রভ পরদার কার্যকারিতা ক্রমে ক্রমে অনেক বেড়েছে। দূরেক্ষণের অগ্রগতির সঙ্গে এই উৎকর্ষ আরও বাড়বে আশা করা যায়।

যে-সব রঙকে আমরা স্বয়ংপ্রভ বলি এবং যাদের এখন নানা রকম প্রয়োজনীয় কাজে লাগান হচ্ছে, তারা দু'রকমের—স্বপ্রভ এবং অনুপ্রভ। দরজা, সিঁড়ি, বিপজ্জনক আনাচ-কানাচ প্রভৃতি যে-সব জায়গায় প্রয়োজন সেই সব জায়গায় অনুপ্রভ রঙ লাগিয়ে রাখলে, চতুর্দিক যথেষ্ট আলোকিত না করেও এগুলো দৃষ্টিগোচর করবার ব্যবস্থা করা যায়।

কয়েকটি অবিমিশ্র রাসায়নিক পদার্থে অবশ্যই সন্দীপ্তির উদ্রেক করা যায়, কিন্তু এদের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন বস্তু আছে যাদের সন্দীপ্তি বস্তুটিতে অপদ্রব্যের মিশ্রণের উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে অপদ্রব্যের পরিমাণ অবিশ্বাস্যরকম স্বল্পলেশ। একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত চুনির তীব্র লাল সন্দীপ্তি। চুনির প্রধান উপাদান কেলাসিত অ্যালুমিনা, কিন্তু সন্দীপ্তির মূলে আছে এর সঙ্গে ক্রোমিক অক্সাইডের লেশমাত্র মিশ্রণ। অপদ্রব্যের পরিমাণ ও প্রকার অদলবদল করে এবং মূল জিনিসের উপর ভৌত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সন্দীপ্তির বর্ণ, তীব্রতা এবং উদ্দীপনা অপসারণের পর তার স্থিতিকাল আশ্চর্যরকমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার, অপদ্রব্য হিসাবে লেশমাত্র নিকেল থাকলে অনুপ্রভা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু স্বপ্রভার উপর নিকেলের বিশেষ কোন প্রভাব নেই; এই আবিষ্কারের যথেষ্ট ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে, কারণ বহুক্ষেত্রে, যেমন দূরেক্ষণ গ্রাহকযন্ত্রে, ক্যাথোড-রশ্মির সংঘাতে তীব্র স্বপ্রভা প্রয়োজন, কিন্তু অনুপ্রভা অবাঞ্ছিত। নিছক

বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বশে শুরু করা গবেষণা যে অনেক সময় প্রয়োগক্ষেত্রে গুরুত্ব-পূর্ণ কাজে লাগতে পারে, সন্দীপ্তি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সবকিছু প্রয়োজনীয় সুখসুবিধার মতো আলোও ব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং আলো যাতে উপযুক্ত পরিমাণে যথাযোগ্য স্থানে পড়ে তার বিচার প্রয়োজনীয়। কাজে কাজেই ব্যবহারিক দিক থেকে আলোকের পরিমাণ পরিমাপের বিষয়টির গুরুত্ব যে যথেষ্ট তা বোঝা যায়; প্রশ্নটির সংগে আবার পদার্থবিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞান-সংক্রান্ত উভয়বিধ বিচারের যোগ রয়েছে। আলোকের পরিমাণ দ্রুত মাপবার উপায় এবং তার জন্য সহজে এবং নিরাপদে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমন সব মজবুদ যন্ত্রাদিও উদ্ভাবিত হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর প্রয়োজনীয় ধরনের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক আলোকমান। আলো যখন সেলিনিয়াম বা ক্যুপ্রস অক্সাইডের মতো কোন অর্ধ-পরিবাহীর উপর পড়ে তখন বিনা ব্যাটারিতেই আবদ্ধ তড়িৎ-পথে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়; বৈদ্যুতিক আলোকমানের ক্রিয়া আলোকের এই আচরণের উপর নির্ভর-শীল। সুতরাং প্রয়োজনীয় জিনিস হ'ল দুটো: এই ধরনের একটি আলোক-কোষ আর একটি সূক্ষ্ম তড়িৎ-প্রবাহ প্রমাপক। দুটোই একই যন্ত্রে অনায়াসে নিবদ্ধ করা যায়।

ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে, বর্ণের নির্দিষ্টীকরণ এবং তাদের মাত্রিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র মোট আলোকের পরিমাণ নির্ণয়ের চেয়ে কিছু কম নয়। প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ বর্ণের সূক্ষ্ম প্রভেদ এবং তীব্রতার সামান্য তারতম্য নির্ধারণে যে দক্ষতা ও বিচারশক্তি দেখান তা এত চমকপ্রদ যে তার সংগে একমাত্র তুলনীয় গুণী সংগীতজ্ঞ সুরের রূপ ও গ্রামের সূক্ষ্মতম প্রভেদ নির্ধারণে যে আশ্চর্য নির্ভুলতার পরিচয় দেন। সুরের বেলায় যেমন, রঙের বেলায়ও তেমনি আমাদের অনুভূতির উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়। এমন অনেক চমৎকার বীক্ষণ-যন্ত্র তৈরি হয়েছে যাদের সাহায্যে এই বিশ্লেষণ করা যায়। বিশেষজ্ঞ শুধু দৃষ্টির উপর নির্ভর করে বর্ণবিচারে যে শিক্ষিতপটুত্ব প্রদর্শন করেন এই যন্ত্রের সূক্ষ্মতা তার সংগে তুলনীয়।

৮। গ্রামাঞ্চলের পদার্থবিজ্ঞান : মৃত্তিকা

সমগ্র কৃষিকর্ম তথা মানব সভ্যতার ভিত্তি এই ধরণীর মৃত্তিকা। অতএব মৃত্তিকার প্রকৃতি ও গুণাবলী এবং তাদের অনুশীলনে অবলম্বিত উপায়সমূহ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সবিশেষ কৌতূহলের বিষয়।

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন উভয়ের দৃষ্টিতেই মাটির প্রকৃতি জটিল ও পরিবর্তনশীল। আমরা যদি মাটির উৎপত্তি এবং প্রকৃতি ও মানুষের হাতে মৃত্তিকার যে পরিবর্তন ঘটেছে এসব বিচার করি তাহলে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সাধারণ চাষযোগ্য জমির অধিকাংশই নানা আকারের খনিজ কণিকার বিষম সমাবেশ। এই সব কণিকার আকার-প্রকার বহু: একদিকে বড় পাথরের টুকরো, অন্য দিকে এত ছোট কণিকা যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণেও তা দেখা যায় না। সাধারণভাবে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মাটিতে যে সব কণিকা থাকে ওজনের অনুপাতে তাদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। কোন বিশেষ মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য তার উপাদানস্বরূপ কণিকাগুলোর আকারের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং মৃত্তিকা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় যান্ত্রিক বিশ্লেষণ নামক ব্যাপারটির উপর অনেকখানি মনোযোগ দেওয়া হয়। এই বিশ্লেষণ মৃত্তিকার কণিকাগুলো আকারের ক্রম অনুসারে কয়েকটি অংশে ভাগ করা এবং প্রত্যেক ভাগের কণিকার ওজন ও সংখ্যা অনুসারে অনুপাত নির্ণয় করা। কিছু মাটি খানিকটা জলের সংগে মিশিয়ে স্তম্ভাকার পাত্রে রাখলে বিভিন্ন আকারের কণিকা বিভিন্ন হারে থিতোয়; যান্ত্রিক বিশ্লেষণের অধিকাংশ উপায় এই প্রক্রিয়ার সুযোগ নেয়। আকারে বড় থেকে ছোট ক্রম অনুসারে এদের বিভিন্ন বর্ণনামূলক নাম দেওয়া হয়েছে—যথা, মিহি কাঁকর, মোটা বালি, মিহি বালি, পলি এবং কাদা। এক অংশ থেকে অপর অংশের আকারের প্রভেদ এত বেশী যে একমাত্র লগারিথম মানের লেখেই এদের আকার দেখান সুবিধাজনক।

যে মাটি জল ধরে রাখতে পারে না সে মাটি কোন কাজে আসে না। কাজে কাজেই মৃত্তিকায় জলের পরিমাণ এবং তার বিতরণ ও সঞ্চরণের আলোচনার সমধিক গুরুত্ব আছে। এক সময়ে মনে করা হ'ত, মাটির মধ্যে জলের আচরণ কৈশিক নলে জলের ঊর্ধ্বগমনের মতো; নল যত সরু হবে জল তত বেশী উঠবে। শুষ্কতাপ্রবণ কাঁকর-মাটি বা বেলে মাটি এবং শুষ্কতাবিমুখ মিহিবালু-মাটি বা কাদামাটির আচরণে যে প্রভেদ দেখা যায়, তা এই সরল পদার্থবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে একদা বিশ্বাস করা হ'ত। কিন্তু সযত্ন পরিমাণগত পরীক্ষা থেকে দেখা যায়, মৃত্তিকার লক্ষিত আচরণ কৈশিক মতবাদের এই সরল সংস্করণ দিয়ে ব্যাখ্যাত হয় না। বাস্তবিক মৃত্তিকার রন্ধ্রগুলোর গঠন কোষের মতো; তুলনায় ছিদ্রগুলো অনেক বড়, অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট নালিকা দিয়ে সংযুক্ত। এই সব রন্ধ্র এবং নালিকার জল এমন ভাবে ব্যাপ্ত যে মুক্ত পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন হয়। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জল

সঞ্চরণের ব্যাপারে সন্নিহিত মৃত্তিকা-কণিকার মধ্যবর্তী রন্ধ্রে ছেদক্ষেত্রের অত্যধিক তারতম্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে জলীয় চাপের সামান্য মাত্র পরিবর্তনে বৃহৎ রন্ধ্রের মধ্যে জল সহজেই সঞ্চারিত হবে, কিন্তু স্বল্পপরিসর গ্রীবার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করতে হলে আরও বেশী চাপের প্রয়োজন হবে। অধিকন্তু, একই কারণে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পরিসরে জল সহজেই সঞ্চারিত হবে, কিন্তু বিপরীত দিকে তা অনায়াসে ঘটবে না। বাস্তবিক সাধারণত তা ঘটে না; কেবলমাত্র পৃষ্ঠদেশের বক্রতা পরিবর্তন করে জল এই সঞ্চরণ প্রতিরোধ করে।

অতএব, মৃত্তিকারন্ধ্রে জলের প্রবেশ ও নির্গমন কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত। বাস্তবিক এই ক্রিয়ার কোনটিই নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, দমকে দমকে হয়; শুধু তাই নয় মাটিতে জলের পরিমাণ বাড়ছে না কমছে তার উপরও জলের আচরণ নির্ভর করে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় শৈথিল্য। কাচের অতি ক্ষুদ্র গোলক অথবা বালুকা নিয়ে বেধশালায় পরীক্ষা দ্বারা এই শৈথিল্য সহজেই প্রদর্শন করা যায়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ঘটনার গুরুত্ব এই যে মৃত্তিকায় আবদ্ধ জল যে-কোন পরিবর্তন প্রতিরোধে চেষ্টিত হয়—পরিবর্তন বৃদ্ধি বা হ্রাস যেদিকে হ'ক। বেশী আর্দ্র অংশে জলের চাপ বেশী, কম আর্দ্র অংশে কম; কিন্তু এই চাপাবনতিজনিত শোষণক্রিয়ার সংগে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য জল রন্ধ্রপথে বেশী আর্দ্র থেকে কম আর্দ্র অংশ অভিমুখে সঞ্চারিত না হয়ে, কেবলমাত্র রন্ধ্রের অভ্যন্তরস্থ বণ্টনে পরিবর্তন ঘটায়।

উদ্ভিদমূলে জল সরবরাহের প্রশ্ন স্পষ্টই এই ব্যাপারের সংগে সম্পর্কিত। কৈশিক মতবাদ আমাদের শিখিয়েছিল, মূল দ্বারা শোষণের ফলে মাটিতে যেখানে শুষ্কতা আসে, অধিকতর আর্দ্র অংশ থেকে সেখানে জল সঞ্চারিত হয়, অর্থাৎ জল আপনিই উদ্ভিদের মূলে গিয়ে পৌঁছায়। এর বিপরীতটাই কিন্তু সত্যি; উদ্ভিদ-মূলকেই জলের সন্ধানে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়তে হয়। এই ব্যাপার অবশ্যই আমাদের সকলের জানা। সতেজ বর্ধনশীল উদ্ভিদমূল যে কতখানি বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

মোটামুটিভাবে সুকর্ষিত জমিতে বৃষ্টি পড়লে কি ঘটবে তার ধারণা আমরা মাটি ও জলের সঠিক সম্পর্ক থেকে পেতে পারি। সাধারণ অবস্থায় মাটি থাকে দানা বা যৌগিক কণিকার সমষ্টি হিসাবে। দানা আবার অনেকগুলো খুব ছোট কণিকা—বিশেষ করে সূক্ষ্মতম কাদামাটির কণিকার সমবায়। এই ক্ষুদ্র কণিকা-গুলোর সংহত হবার ক্ষমতা যথেষ্ট। দানাগুলোর মধ্যে যেমন রন্ধ্র আছে দানার কণিকাগুলোর মধ্যে তেমনই সূক্ষ্মতর রন্ধ্র আছে। মোটামুটি শুষ্ক মাটিতে বৃষ্টি পড়লে, উপরিতন স্তরের দানার অন্তস্থ সূক্ষ্ম রন্ধ্রসমূহে জল প্রবেশ করে। বাড়তি জল দানাগুলোর মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত বড় কোষধর্মী রন্ধ্রগুলোর মধ্যে দিয়ে নিচের স্তরে চলে যায়। এই ভাবে প্রত্যেক স্তরই কিছু পরিমাণ জল আদায় করে নেয়। বৃষ্টির জলের পরিণতি বৃষ্টির পরিমাণ ও মৃত্তিকার আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল।

অবস্থার তারতম্য অনুসারে দুটি বিপরীত ঘটনার যে-কোন একটি ঘটতে পারেঃ বৃষ্টিপাতের সবটাই মাটির উপরের স্তরে থাকতে পারে, কিংবা বৃষ্টির জল মৃত্তিকাস্থ জলকে স্থানচ্যুত করতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে মৃত্তিকায় স্থিত জল ভূগর্ভস্থ জলপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মাটির প্রত্যেকটি দানাকে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলাধার মনে করা চলে, উদ্ভিদের মূলতন্ত্রে কেশমূল সক্রিয়ভাবে যার অনুসন্ধান করে।

লাঙল সমগ্র কৃষিকর্মের প্রতীক। কারণ, কৃষিকার্যের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় যান্ত্রিক উপায়ে মৃত্তিকাকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন যন্ত্রাদির সাহায্যে জমি তৈরি করা। কৃষিকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম এবং আবশ্যক ক্রিয়াদির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় মৃত্তিকার যান্ত্রিক গুণাবলী দ্বারা। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এই সব প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য বিভিন্ন, সুতরাং তাদের ধরনও আলাদা। যেমন প্রথমে জমির চাঙড় ভাঙা, জমিতে যে-সব আগাছা গজিয়েছে সেগুলো সাফ করা, তার পর বীজ বপনের উপযুক্ত করে জমি চৌরস করা, বীজ ছড়ান বা চারা লাগান এবং ইত্যবসরে যে-সব আগাছা আবার গজিয়েছে এবং যারা জমি থেকে খাদ্য আহরণে ফসলের প্রতিযোগী হতে পারে, তাদের উচ্ছেদ করা, প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। চাষের খরচের একটি বড় অংক লাগে জমি তৈরি করতে এবং আগাছা সাফ করতে। সুতরাং মৃত্তিকাবিজ্ঞানে এই ব্যপদেশে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনার মূল্য যথেষ্ট।

হলসঞ্চালনে মৃত্তিকা যে বাধা দেয় তা অবস্থার তারতম্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। অবশ্য এই বাধা মৃত্তিকার প্রকৃতি বিশেষ করে তার তৎকালীন অবস্থা-সাপেক্ষও বটে। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে শুষ্ক জমিতে লাঙল দেওয়া দুঃসাধ্য এবং এক পশলা বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এরকম জমির কর্ষণ স্থগিত রাখতে হয়। একখণ্ড জমিতে লাঙল দিতে কতখানি শ্রম আবশ্যক তা অনেকখানি নির্ভর করে লাঙলের ফাল মাটির ভিতরে কতখানি প্রবেশ করে তার উপর। বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকায় হালটানা পশু বা যন্ত্রের সামর্থ্যের উপযোগী লাঙল তৈরি করার জন্য বহু প্রচেষ্টা এবং কলাকৌশল অবলম্বিত হয়েছে। যান্ত্রিক কৃষিকর্মে হালটানার সামর্থ্যের সীমার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু পশু দিয়ে হাল টানলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্য রকম দাঁড়ায়। তখন এই সীমা নির্ধারিত হয় পশুর দৈহিক সামর্থ্য এবং সংখ্যা দিয়ে। ফলার যেটুকু মাটিতে বসে গিয়ে মাটিকে কাটে, তা ছাড়া আর একটু উপরের অংশ 'আসন' লাঙলের একটি প্রধান ভাগ। আসনের কাজ মাটিকে নিচে থেকে তুলে পাশে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে ওলটানো মাটির মাঝে পরিষ্কার হলরেখা পাওয়া যায়! আসনের আকার কি রকম হ'লে এই কাজ সবচেয়ে ভালভাবে হয় সে বিষয়ে বহু পরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে।

মৃত্তিকা সছিদ্র বস্তু হওয়ায় তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বায়বীয় পদার্থ থাকবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই আবদ্ধ বাতাসের সংযুতি নানা ব্যাপারের উপর নির্ভর করবে, বিশেষ করে উদ্ভিদমূল ও জীবাণু দ্বারা অক্সিজেন শোষণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্গমের পরিমাণের উপর। কাজে কাজেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কত

দ্রুত বাইরের বাতাসে মিশে যেতে পারে এবং তার স্থান অক্সিজেন দখল করতে পারে সংযুতি তার উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকার উষ্ণতার তারতম্যে বাতাসের সংকোচন-প্রসারণ; বৃষ্টিপাত, জলসেচ ও মৃত্তিকাস্থ জলের বাষ্পীভবনের ফলে রন্ধ্রসমূহের আয়তনের পরিবর্তন; বাতাসের ক্রিয়া; বায়ুচাপের পরিবর্তন—সবই এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকায় আবদ্ধ বায়ু অত্যাবশ্যক বস্তু।

মৃত্তিকার পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিষয় মৃত্তিকার উষ্ণতা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেকখানি, কারণ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে উষ্ণতার প্রভাব যথেষ্ট হতে বাধ্য। মৃত্তিকা দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে শোষিত ও মুক্ত তাপের পরিমাণের অন্তরফল ও মৃত্তিকার অভ্যন্তরে তাপ পরিবহণের উপর এই উষ্ণতা নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে অধিক আলোচনার আর অবকাশ নেই।

৯। গ্রামাঞ্চলের পদার্থবিজ্ঞান : জল

যে কাল্পনিক সুধার কণামাত্র পান করলে অমরত্ব লাভ হয় বলে মানুষ বিশ্বাস করত, সেই দেবদুর্লভ অমৃতের বৃথা সন্ধানে মানুষ যুগের পর যুগ কাটিয়েছে। সত্যকার অমৃত কিন্তু আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে—শুধু জল, সবচেয়ে সাধারণ তরল পদার্থ। একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে, যেদিন মিশরের নীলনদের উপত্যকা ও লীবিয়ার মরুভূমি যেখানে মিশেছে সেই সীমারেখায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। সীমারেখার একদিকে তরঙ্গিত বালুকাসমুদ্র, যতদূর দৃষ্টি যায় এক কণা সবুজের ছোঁয়া বা জীবনের সামান্যতম নিদর্শন নেই। অপর দিকে দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজ, অত্যন্ত উর্বরা এবং পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের অন্যতম লোকবহুল অংশ, উদ্ভিদসম্ভারে এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। এই আশ্চর্য পার্থক্য কি করে সাধিত হ'ল ? এর মূলে অবশ্যই নীলনদের জলধারা, দু হাজার মাইল দূর উৎস থেকে এসে যা ভূমধ্যসাগরে মিশেছে। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন নীল-উপত্যকার সমগ্র মৃত্তিকা এই নদের দান। প্লাবনের সময় সূক্ষ্ম পলিরূপে বাহিত হয়ে এই মাটি আবিসিনিয়ার উচ্চভূমি ও সুদূর মধ্য আফ্রিকা থেকে এসে নীল যে নিম্নভূমি দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেখানে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। বস্তুত এই নদই মিশরকে সৃষ্টি করেছে বলা যায়। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার স্রষ্টা ও রক্ষক নীলনদের প্রাণদাতা জলরাশি প্রতি বৎসরই নিয়মিত সে দেশকে প্লাবিত করতে বিস্মৃত হয় না।

এই যে অতি সাধারণ বস্তুটিকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন প্রাধান্য দিই না, সেটি যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আশ্চর্যতম বস্তু, তার একটি মাত্র দৃষ্টান্তই আমি দিলাম। এই রকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা নির্ধারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে এই বস্তু; এই গ্রহের জীবননাট্যে তা অদ্যাবধি প্রধান ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

গ্রামের সৌন্দর্যসাধনে জলের দান অসামান্য। পাথরের উপর উপচে-পড়া ছোট ঝরণা বা পথপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র জলাশয় যাই হ'ক, সেখানেই গোধূলিবেলায় গোধন আসে তৃষ্ণা নিবারণ করতে। দাক্ষিণাত্যে সুপরিচিত বর্ষণপুষ্ট পুষ্করিণীগুলোর কানায় কানায় পূর্ণ রূপ নয়নানন্দদায়ক। দুঃখের বিষয় এদের রক্ষণাবেক্ষণে প্রায়ই মনোযোগের অভাব দেখা যায়। এই সব পুকুর অবশ্য অধিকাংশক্ষেত্রে অগভীর, কিন্তু জল যখন পলিমাটিতে পূর্ণ থাকে তখন তা থেকে আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় অগভীরত্ব বোঝা যায় না। দক্ষিণ ভারতের কৃষি-ব্যাপারে এই সব সরোবরের সমূহ উপকারিতা দেখা যায়। যেমন, মহীশূরে ধানের ফসলের বেশ কিছু অংশ এই সব পুকুরের বুকেই ফলান হয়। নিসর্গদৃশ্যে জলের স্থান মানুষের মুখমণ্ডলে চোখের সঙ্গে তুলনীয়, কারণ তা তাৎকালিক ভাবের পরিচায়ক—সূর্যালোকে খুশি ও উজ্জ্বল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে নিরানন্দ ও নিষ্প্রভ।

জলের একটি প্রধান গুণ বিলম্বিত পলি বা সূক্ষ্ম মৃত্তিকাচূর্ণ বহন করে নিয়ে যাবার ক্ষমতা। বর্ষণস্ফীত পুষ্করিণীর বর্ণবৈশিষ্ট্যের কারণ এই থেকে পাওয়া যায়। এই বর্ণ পরিবাহক্ষেত্রের মৃত্তিকার প্রকৃতিসাপেক্ষ এবং বৃষ্টির অব্যবহিত পরে জলাগমে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সর্বাধিক হতে দেখা যায়। খরস্রোত জল বেশ বড় এবং ভারি বস্তুকণা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম কণাগুলো অধিক ঘনত্ব সত্ত্বেও জলে বহুক্ষণ বিলম্বিত থাকে এবং বহু দূর পর্যন্ত বাহিত হয়। এই সব কণিকা আকারে অবশ্য খুবই ছোট কিন্তু তাদের সংখ্যাও তো অনেক; সুতরাং এত প্রভূত পরিমাণ কঠিন বস্তু এইভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে যে বিশ্বাস করা কঠিন। পলিমিশ্রত জল যখন সমুদ্রের লোনা জলের সঙ্গে মেশে তখন এই বিলম্বিত পদার্থ দ্রুত প্রক্ষিপ্ত হয়। বৃহৎ নদীপথে জাহাজে করে গভীর সাগরে পড়বার সময় এই ব্যাপার সহজেই লক্ষ করা যায়। জলের রঙ ক্রমান্বয়ে বদলাতে থাকেঃ প্রথমে পলিমাটির লাল বা বাদামী, তার পর হলুদ এবং সবুজের নানা প্রকারভেদ, সর্বশেষ গভীর সাগরের নীল। বিরাট ভূখন্ড যে এই ভাবে পলি জমে গড়ে উঠেছে, পাললিক অঞ্চলের মৃত্তিকা পরীক্ষা করে তা প্রমাণ করা যায়। সূক্ষ্ম কণিকা দিয়ে গঠিত হওয়ায় এই রকম মৃত্তিকার উর্বরতা সাধারণত খুব বেশী।

যে-সব ভূতত্ত্বঘটিত প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর উপরিতন শিলাস্তর মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে, জলপ্রবাহ তাতে যে কাজে লেগেছে তা নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও উপকারী। একই বস্তু আবার অবস্থাভেদে অকল্যাণের কারণ হতে পারে এবং কৃষিকর্মের যা ভিত্তি সেই মাটি ধুয়ে একাকার করতে পারে। নিরঙ্কুশ চলতে দিলে কোন দেশের জীবনযাত্রায় এর ফল সমূহ অনিষ্টজনক। মৃত্তিকাক্ষয়ের সমস্যা বহু দেশেই—বিশেষ করে ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলে—যথেষ্ট গুরু। যে যে অবস্থায় মৃত্তিকাক্ষয় ঘটে এবং কোন কোন উপায় অবলম্বন করলে তা নিবারণ করা যায় সে সম্পর্কে নিবিষ্ট পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। মৃত্তিকাক্ষয় অগ্রসর হয় শনৈঃ শনৈঃ, যার সূত্রপাত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। শেষ অবস্থায় ধুয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে জমি যখন নালি-জুলিতে ভর্তি হয়ে যায়, যে-কোন রকম চাষ যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, মৃত্তিকাক্ষয় তখন বেদনাদায়ক রূপে প্রকট হয়। মৃত্তিকাক্ষয়ের প্রধান কারণ হঠাৎ হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে অতিরিক্ত জলের মাটি ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অন্যান্য পোষক কারণঃ জমির ঢাল, স্বাভাবিক বর্মস্বরূপ উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উচ্ছেদ, জমিতে নালির আবির্ভাব যার মধ্য দিয়ে জল ক্রমশ খরতর বেগে প্রবাহিত হয়, এবং সেই প্রবাহকে বাধা দেবার উপযুক্ত উপায়ের অভাব। এই সব অবস্থায়—পরিতাপের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই তা বর্তমান—মহামূল্যবান মৃত্তিকা অত্যধিক পরিমাণে জলে ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলপ্রসূ ও অব্যাহত কৃষির বিঘ্ন-স্বরূপ মৃত্তিকাক্ষয় ভারতের বহু অংশেই ভীতিজনক। এ বিষয়ে মনোযোগ দান এবং নিবারক ব্যবস্থা অবলম্বন অবিলম্বে প্রয়োজন। এ সম্পর্কে প্রস্তাবিত উপায়ের কয়েকটি হ'লঃ ঢাল জমিতে ধান-চাষ, জল আটকাবার জন্য বাঁধ দেওয়া, সমোন্নতি রেখা অনুযায়ী হলকর্ষণ এবং উপযুক্ত উদ্ভিদের ব্যবহার। এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে সবিশেষ ভরবেগ সংগ্রহ করার পূর্বে এবং প্রচুর ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করার

আগে, যত শীঘ্র সম্ভব জলের প্রবাহকে বাধা দেওয়াই এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য।

জল সমগ্র জীবজগতের মূলাধার। প্রত্যেক প্রাণী এবং প্রতিটি উদ্ভিদের দেহের একটি বৃহৎ অংশ—সংযুক্ত বা মুক্ত অবস্থায় জল, প্রত্যেকটি শারীর-ক্রিয়ার যার প্রয়োজন অপরিহার্য। প্রাণীমাত্রের প্রাণধারণের জন্য জল অবশ্যপ্রয়োজন। গুল্ম থেকে মহীরুহ পর্যন্ত সকল উদ্ভিদের জীবনধারণ ও বৃদ্ধি মাটিতে জল না থাকলে সম্ভব নয়; উদ্ভিদের প্রজাতি অনুসারে অবশ্য এই প্রয়োজনের যথেষ্ট তারতম্য হয়। সুতরাং, জলের সংরক্ষণ ও সুব্যবহার মানবকল্যাণের একটি মূল প্রয়োজন। উৎস-কূপ বাদ দিলে, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সর্বত্রই জল পাবার মূলে বৃষ্টি বা তুষারপাত। ভারতের চাষের কাজ বেশীর ভাগ মরশুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে, সুতরাং বৃষ্টির অনিয়ম বা অভাব ঘটলে কৃষি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর্যাপ্ত বা অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের সঙ্গে মৃত্তিকাক্ষয়ের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে মৃত্তিকাক্ষয় নিবারণের উপায়গুলো অবলম্বন করলে জলও সংরক্ষিত হয়ে যেখানে তার প্রয়োজন সেখানেই অর্থাৎ মাটিতেই থাকবে। দেখা যাচ্ছে এই সব উপায় এইভাবে দ্বিবিধ উপকার সাধন করে। একথা বুঝতে কষ্ট নেই যে যে-দেশে বৃষ্টি-পাত নির্দিষ্ট ঋতুতেই মাত্র ঘটে, সেখানে প্রচুর জল মাটি থেকে গড়িয়ে চলে যাবে এবং সেহেতু এই জলের সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জলের বড় অংশ নদী-নালাতে মিশে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে চলে যায়। দেশের কোন উপকারে না এসে প্রচুর জলরাশি এইভাবে নষ্ট হয়। অধিকাংশ নদীর জলের যে এই ভাবে অপচয় হচ্ছে, সেটি একটি জাতীয় সমস্যা। জাতীয় ভিত্তিতে এই সব নদীর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিচার ও নিষ্পত্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়। এমন অনেক বৃহৎ অঞ্চল এখনও পতিত রয়েছে যেখানে কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। সাহসিক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা এই সব জমি উর্বর সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করা সম্ভব। জল-সরবরাহ সংরক্ষণ ও বনরোপণ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সমস্যা। ভারতবর্ষের একটি জরুরি প্রয়োজন প্রত্যেকটি সম্ভব—এমন কি অসম্ভব—অঞ্চলে নিয়মিত উপযুক্ত বৃক্ষ রোপণ, এবং উদ্দাম অরণ্যের পরিবর্তে যাকে সংযত বা 'ভদ্র' অরণ্য বলা যায় তার সংস্থাপন। এই সব বনস্থলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের সমৃদ্ধির বৃহৎ কারণ হয়ে দাঁড়াবে; মৃত্তিকার ক্ষয় নিরোধ করবে এবং ধুয়ে বেরিয়ে যেতে না দিয়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করবে। এ ছাড়া, বনভূমি থেকে শস্তায় জ্বালানি পাওয়া যাবে এবং খামারবাড়ীর সার, গোময়, জ্বালানি রূপে নষ্ট করবার প্রয়োজন আর থাকবে না।

জলের গতি নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ সংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলি গ্রামাঞ্চলের জীবন-যাত্রায় আনুষঙ্গিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। আভ্যন্তরিক পরিবহণের সবচেয়ে স্বল্পব্যয় উপায় নদী ও খালে নৌকা-চলাচল। রেলপথ ও স্থলপথ নির্মাণের পরি-কল্পনার কথা আমরা অনেক শুনতে পাই, কিন্তু আভ্যন্তরিক জলপথ বিস্তারের কথা বড় একটা শুনি না। অধিকন্তু জল-সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করলে সঙ্গে সঙ্গে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাও হতে পারবে। তড়িৎ-শক্তি সহজপ্রাপ্য হলে গ্রামীণ জীবনে যথেষ্ট

পরিবর্তন এবং গ্রামাঞ্চলের আর্থিক অবস্থার বহুমুখী উন্নতি সম্ভব হবে। বিশেষ করে, ভূগর্ভ থেকে জল সংগ্রহের পরিমাণ আগের চেয়ে বাড়বে এবং অন্য উপায়ে প্রাপ্ত জলের অনিয়ম ও অপ্রতুলতায় যে-সব অসুবিধা ঘটে তা দূর করতে সহায়তা করবে।

এক অর্থে জল অত্যন্ত সাধারণ তরল পদার্থ; অন্য অর্থে আশ্চর্য গুণসম্পন্ন অসাধারণ বস্তু। সেই গুণের জন্যই জল প্রাণী ও উদ্ভিদের জৈব ক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানের দিক থেকে জলের প্রকৃতি ও গুণাবলী সম্পর্কে গবেষণার আকর্ষণ যথেষ্ট। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এখনও নিঃশেষিত হয় নি।

১০। গ্রামাঞ্চলের পদার্থবিজ্ঞান ঃ আবহাওয়া

শহরবাসীর পক্ষে আবহাওয়া অন্য অনেক অসুবিধার একটি; বাড়ী থেকে বেরবার সময়ে ছড়ি না নিয়ে কখন ছাতা নিতে হবে সে বিষয়ে আগে থেকে একটু মনোযোগ দিলেই এই অসুবিধার অনেকখানি লাঘব করা যায়। আশা করি একথা বললে অত্যুক্তি মনে হবে না যে কোন বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনার কারণ না হলে আবহাওয়া সম্পর্কে কোন চৈতন্যই সাধারণ শহরবাসীর থাকে না। আকাশের পট-পরিবর্তন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপূর্বসুন্দর দৃশ্য প্রায়ই এ'দের নজরে পড়ে না, কারণ সখেদে স্বীকার করতে হয় যে এ'দের চোখের সামনে যে দৃশ্য নিয়ত প্রকট তা হচ্ছে বাসগৃহের দীর্ঘ শ্রেণী। আকাশের যে দু-একটি টুকরো তাঁরা দেখতে পান, তাও আবার টেলিফোনের তারে কণ্টকিত। রাত্রে যে-সব তারকা তাঁদের নজরে পড়ে তারা ছবিঘরের রূপালী পরদায় ভাস্বর। চন্দ্রসূর্য সম্বন্ধে তাঁরা এইটুকু জানেন যে এরা আছে; এর বেশী মাথা ঘামান তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন না।

গ্রামের জীবনে আবহাওয়া কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা পৃথিবীর উন্মুক্ত অঞ্চলে বাস করেন তাঁরা সর্বাবস্থায় আকাশ পর্যবেক্ষণ করে আবহাওয়া বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন, কারণ তাঁদের বৃত্তি ও সমৃদ্ধি, এমন কি জীবনও, নির্ভর করে আকাশের কৃপার দানের উপর। কালিদাস ঋতুসংহারে ঋতুচক্রের যে অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন, ভারতের গ্রাম্য জীবনচক্র তার সদৃশ। ওয়শিংটন আরভিং-এর সুপরিচিত কাহিনীর নায়ক রিপ ভ্যান উইংক্‌লের মতো কেউ যদি সুদীর্ঘ নিদ্রার পর কালক্ষেপের পরিমাণ না জেনে ঘুম ভেঙে ওঠেন তা হলে তিনি যে-কোন পরিচিত অঞ্চলে শুধু চাষ-আবাদের অবস্থা দেখে মোটামুটি তারিখ আন্দাজ করতে পারবেন, বড়জোর দুই এক সপ্তাহের ভুল হতে পারে। আমাদের দেশের অনেক বড় বড় অঞ্চল সব রকম কৃষিকর্মের জন্য শুধু বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই সব অঞ্চলে যাঁরা চাষ-আবাদ করেন তাঁদের পঞ্জিকার সর্বপ্রধান দিনগুলো হ'ল আকাশের স্রোতোদ্বার যখন খোলে এবং বন্ধ হয়।

ভারতের জনৈক প্রাক্তন অর্থসচিব একবার মন্তব্য করেছিলেন যে প্রতি বছর তাঁকে যে বাজেট রচনা এবং পেশ করতে হয় তা হ'ল 'বৃষ্টির উপর বাজি ধরা'। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কৃষির প্রাধান্য এবং কৃষির উপর আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রক প্রভাব কতখানি, এই উক্তিতে তা অত্যন্ত জোরাল এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গত শতাব্দীতে সরকার যে একটি আবহ-বিভাগ খোলেন, তার প্রধান কারণ কৃষি ও সরকারী অর্থব্যবস্থার এই নিকট সম্পর্ক বলে বোধ হয়। আবহাওয়া সম্পর্কিত খবরাখবর, বিশেষ করে ঝটিকার পূর্বাভাস—ঝটিকা যখন উপকূলবর্তী পোতের ক্ষতি করতে পারে অথবা ধ্বংসাত্মক প্লাবন আনতে পারে—অবশ্যই জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে যে মরশুমী বৃষ্টিপাত হয়, তার প্রাবল্য ও বণ্টন সম্পর্কে

অনেক আগে আভাস দেওয়া সম্ভব হলে, তাও অবশ্য যথেষ্ট উপকারী হবে। আবহ-বিভাগের অস্তিত্বের প্রথম যুগে এই সব উদ্দেশ্যই বিভাগের প্রধান কর্মপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অসামরিক বিমানপথের প্রসার হওয়ায় এবং সেই কারণে নির্ভুল আবহ-সংবাদ—বিশেষ করে স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য স্বল্পকালীন পূর্বাভাসের প্রয়োজন ঘটায়, আবহ-বিভাগের সম্প্রসারণ হয়েছে। একথা সবাই জানেন যে যুদ্ধের* প্রয়োজনে এই বিভাগের কর্মিসংখ্যা বিরাটভাবে বেড়েছে এবং আবহ-সংবাদের বেতার-প্রচারের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। কৃষিসম্পর্কীয় আবহবিজ্ঞান শাখার স্থাপনা থেকে এটা আমরা বুঝতে পারি যে কৃষির ব্যাপারে এই বিভাগ যে নানা সম্ভাব্য উপকার সাধন করতে পারে, কর্তৃপক্ষ সেকথা বিস্মৃত হন নি। সামান্য হালচাষী যিনি এতকাল নিজের কাজের জন্য আপন অভিজ্ঞতা ও আবহ-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আসছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনিও সম্ভবত উপকৃত হবেন।

ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে আবহবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে বার বার তার উল্লেখ করা চলে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কোন ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় এই বিষয়ে শিক্ষাদান বা গবেষণাব্যবস্থার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। দেশের সত্যিকার প্রয়োজনের সঙ্গে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়ের অভাবের বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে এও একটি। আমার মতে, আবহবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যাপকতম প্রসার এবং ভারতীয় আবহবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার বিষয়ে সক্রিয় আগ্রহ জন্মানর প্রয়োজন অপরিহার্য। আমার সনির্বন্ধ আবেদন, ভারতের প্রতিটি বিশ্ব-বিদ্যালয় এ বিষয়ে কিছু করুন,—না হয় মাত্র একশ' টাকা বেতনে এমন একজন সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করুন, যিনি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষা নিয়ে ছাত্রদের বিষয়টি শিক্ষা দিতে পারবেন। আমার মনে হয় আগে অনেকের মনে এই ধারণা ছিল যে আবহবিজ্ঞান এমন বিষয় যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে সে সম্বন্ধে কিছু করার প্রয়োজন নেই এবং করা সম্ভবও নয়। এ ধারণার মূলে কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি বরং মনে করি, বেসরকারী বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষকতায় বিদ্যাশ্রয়ী বিজ্ঞানীরা অনেক প্রকৃত মূল্যবান কাজ করতে পারেন। সরকারী আবহ-বিভাগ থেকে যে সহযোগিতা এ প্রসঙ্গে প্রয়োজন, তা যে চাইলেই পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ভারতীয় আবহবিজ্ঞানকে একটি পৃথক বিষয়রূপে উল্লেখ করার স্বপক্ষে কিছু যুক্তি আছে। সেই যুক্তি হচ্ছে ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান ঃ উত্তরে হিমালয়-শ্রেণী ভারতকে তিব্বতের মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে; দক্ষিণাপথ উপদ্বীপের দুইপাশে জলরাশি, একদিকে আরব সাগর ও অপর দিকে বঙ্গোপসাগর এবং তার প্রান্তে পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বত-শ্রেণী। এই ভৌগোলিক সংস্থান ভারতের অতীত ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল, দেশের আবহ-অবস্থা নিরূপণে

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—অনুবাদক।

তেমনিই প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে। ভারতের স্থানীয় ও মরশুমী আবহাওয়ার তারতম্যের বিশেষত্বের জন্য এই সংস্থান দায়ী। একথা অবশ্য ভুললে চলবে না যে ভারতের আবহসংস্থান পৃথিবীর আবহসংস্থানরূপ বৃহত্তর বিষয়ের অংশমাত্র। প্রথমটির আলোচনা পরেরটির সমন্বয়ে হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীর পরিমণ্ডলের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার চাপ, উষ্ণতা ও আর্দ্রতা দ্বারা, সুতরাং এইগুলি সম্পর্কে আবহবিজ্ঞানীরা আগ্রহান্বিত। চাপের যে অবস্থায় সাম্য থাকে, তার বিতরণে কোন তারতম্য ঘটলে বায়ুমণ্ডলে অনুভূমিক প্রবাহ ঘটবে, এই প্রবাহকে আমরা বাতাস বলি। এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে পৃথিবীর এক স্থান থেকে অপর স্থানে বাতাস অবিরত প্রবাহিত হতে থাকলে এক জায়গায় বাতাসের প্রাচুর্য ঘটবে আর অপর স্থানটি বায়ুশূন্য হয়ে যাবে। এটা যখন সম্ভব নয়, তখন অবশ্যই অন্য কোথাও বিপরীতভাবে বায়ুসঞ্চরণ ঘটবে। এই স্থানের সন্ধান করব কোথায়? স্বভাবতই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে। এই সামান্য আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের অবস্থা এবং সেখানকার বায়ুপ্রবাহ আবহবিজ্ঞানে এত গুরুত্ব কেন পেয়েছে। বাস্তবিক, পৃথিবীপৃষ্ঠে কি ঘটছে বুঝতে হলে আরও অনেক উপরে কি হচ্ছে জানা এবং দুই স্থানের ঘটনার মধ্যে সমন্বয়সাধন প্রয়োজন। এই কারণেই আবহবিজ্ঞানে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তর সম্পর্কে নিয়মিত অনুসন্ধান চালান হয়ে থাকে। মুক্ত বেলুনের গতি পর্যবেক্ষণ করে কিংবা যন্ত্রবাহী বেলুন উপরে পাঠিয়ে এই সন্ধান করা হয়। যন্ত্রবাহী বেলুনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো ঊর্ধ্ব আকাশের অবস্থার পাঠ নেয় এবং বেতার সঙ্কেত সাহায্যে ভূমিতে অবস্থিত গ্রহীতার কাছে তা পাঠায়।

যে-দুটি লক্ষণীয় প্রত্যাবর্ত আবহঘটনাকে আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুম বলি, তারাই সংশ্লিষ্ট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বিতরণ নির্ধারণ করে। ভারতের কৃষিসম্পর্কীয় অর্থনীতিতে এই মৌসুমের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। সকলেই জানেন, মৌসুমকালে অবিরত বর্ষণ হয় না, যাকে আমরা চাপাবনমন বলি তার উদ্ভবের পর পর মাত্র বৃষ্টিপাত ঘটে। চাপাবনমনের উদ্ভব হয় সমুদ্রের উপর এবং প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ও বারি বহন করে স্থলভাগের উপর তা সঞ্চারিত হয়। নির্দিষ্ট সময় পর পর চাপাবনমনের উৎপত্তি ও সংশ্লিষ্ট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভারতীয় কৃষির ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ভারতীয় আবহবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ও কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা চাপাবনমনের সৃষ্টি ও সঞ্চরণ।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহ-অবস্থার উপাদানগুলির মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে যে কথা আমাদের ভাল করে মনে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন অঞ্চলের আলোচনা করলে আমরা সত্যিই দেখতে পাই, এদেশে সর্বপ্রকার আবহঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। বৃষ্টির কথাই ধরা যাকঃ চেরাপুঞ্জিতে অবিশ্বাস্য পরিমাণ বেশী, বাংলায় এবং পশ্চিম ঘাটে প্রচুর, উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে মাঝামাঝি, অভ্যন্তরভাগে যৎসামান্য এবং সর্বশেষ রাজপুতানার বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চল। উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে তুহিন

জমে এবং তুষারপাত ঘটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের উচ্চতম অঞ্চলেও নিতান্ত কালেভদ্রে ছাড়া তুহিন জমতে দেখা যায় না। ত্রিবাঙ্কুরের সম্বৎসরব্যাপী আর্দ্র উষ্ণতা এবং উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশে গ্রীষ্মকালীন প্রখর শুষ্ক উষ্ণতা ও শীতকালীন রৌদ্রোজ্জ্বল তীব্র শীত—এই দুই আবহাওয়ার তুলনা করলে এর চেয়ে বেশী তফাৎ কিছু কল্পনা করা যাবে না। এ কথা সত্যিই বলা চলে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের আঞ্চলিক আবহবিজ্ঞান আছে। এই সব অঞ্চলের বাস্তব সমস্যার আলোকে আঞ্চলিক আবহ-বিজ্ঞানের পর্যালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন।

পরিশেষে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আবহবিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতীয় আবহবিজ্ঞানের, পর্যালোচনা এবং বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ উদ্রেকের সবিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনাদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ছাত্র এবং শিক্ষক, উভয়েই যাতে এদিকে মনোযোগ দেন, সেজন্য আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবহবিজ্ঞান সম্পর্কে সক্রিয় পর্যালোচনা ও গবেষণা কেবল বৈজ্ঞানিক বিচারেই সুফলপ্রসূ হবে তা নয়, ভারতের সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শিল্প কৃষির উন্নতিবিধানেও তা যথেষ্ট ফলদায়ক হবে।

১১। কাচের রোম্যান্স

শিল্পবিস্তার বিষয়ে ভারতবর্ষে এখন যথেষ্ট মনোযোগ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আজকের ভাষণ আমি এমন একটি পুস্তকের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, যার বিষয়বস্তু বিজ্ঞান ও শিল্পের পরস্পর-নির্ভরতার একটি চমৎকার উদাহরণ। বইটির নাম 'দি প্রপার্টিজ অফ গ্লাস' (কাচের গুণাবলী); রচয়িতা ওয়াশিংটনস্থ কার্নেগি ইন্সটিট্যুটের ভূপদার্থবৈজ্ঞানিক বেধশালার কর্মী জি ডাব্লিউ মোরে। অ্যামেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটী কর্তৃক প্রচারিত বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগশিল্প সম্পর্কীয় গ্রন্থমালার এটি সপ্তসপ্ততিতম নিবেদন। বইটি প্রকাশ করেছেন নিউ ইয়র্কের রাইনহোল্ড পাবলিশিং কর্পোরেশন; মূল্য সাড়ে বারো ডলার।

প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রী মোরে বলেছেন, কাচশিল্পের সূচনা হয় মানবসভ্যতার উন্মেষের সময়। স্বাভাবিক অবস্থায় অব্সিডিয়ান নামক মণিক রূপে কাচ পাওয়া যায়। আদিম মানব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিল যে এই বস্তুটি সহজেই তীক্ষ্ণাগ্র খণ্ডে ভাঙে এবং খণ্ডগুলো প্রায়ই দীর্ঘ হয়। এই সব টুকরো দিয়ে অনায়াসে তীরের ফলা, বর্শার অগ্রভাগ ও ছুরি তৈরি করা যায়; প্রস্তর-যুগের কৃষ্টিতে অব্-সিডিয়ানের এইভাবে ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মানব ইতিহাসের বহু প্রাচীন কালেই কৃত্রিম উপায়ে কাচ নির্মাণ আরম্ভ হয়েছিল। এমন মনে করবার কারণ আছে যে চীন, মেসোপোটেমিয়া ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতা কাচনির্মাণ-কৌশল আবিষ্কারের সম্মান সমভাবে দাবী করতে পারে। রোমক সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকেই কাচের পাত্র নির্মাণ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৈনন্দিন গৃহকর্মে কাচের তৈজস তখনও নিতান্ত সাধারণ জিনিষ হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে ভেনিস কাচশিল্পের একটি বৃহৎ ও খ্যাত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং সুকৌশল কারুকলা ও গঠনসৌন্দর্যের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। সেই প্রতিষ্ঠা আজও অম্লান রয়েছে।

শ্রী মোরে বলেছেন, ঊনবিংশ শতকে কাচনির্মাণ শিল্পে যে উন্নয়ন ঘটে তার অধিকাংশের মূলে বীক্ষণ-কাচ নামক বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এক ধরনের কাচ। উৎপন্ন মোট কাচের একটি অকিঞ্চিৎকর অংশ মাত্র বীক্ষণ-যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরিমাণ বাদ দিয়ে গুণের কথা ধরলে দেখা যাবে, এই জাতীয় কাচের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর নিরিখ অত্যন্ত কড়া। বীক্ষণ-কাচ বুদ্বুদলেশহীন, অগলিত কণিকা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সর্বাংশে সমধর্মী হওয়া একান্ত আবশ্যক। অধিকন্তু, এই কাচ বর্ণহীন হওয়া প্রয়োজন এবং পূর্বনির্দিষ্ট মানের সঙ্গে তার প্রতিসরণাঙ্ক ও আলোক-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা মেলা চাই। এতগুলো কঠিন দাবী মিটিয়ে কাচ তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করতে কাচের নির্মাণশিল্প সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বিরাটভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ সর্বপ্রকার

কাচের উন্নতিবিধান সম্ভব হয়েছে। এই উন্নতিবিধানে জার্মানীর য়েনা শহরের শট্ ও অ্যাবের যুক্ত দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ কথা সুবিদিত যে এই দুই গবেষক বিশেষ গুণসম্পন্ন বহু প্রকার কাচ নির্মাণে সমর্থ হ'ন এবং তদ্দ্বারা কাচশিল্পে এক বিপ্লবের সূচনা করেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, তাঁরা যে নতুন জ্ঞানসম্ভারের সৃষ্টি করেন তা সমগ্র কাচশিল্পের উপকার সাধন করেছে।

কাচ যখন হাতে তৈরি হ'ত তখন যথেষ্ট দক্ষতা ও প্রচুর শ্রম প্রয়োজন হ'ত; সুতরাং কাচ সে সময়ে স্বভাবতই প্রায় মণিতুল্য মূল্যবান বস্তুরূপে পরিগণিত হ'ত এবং অলঙ্কার নির্মাণে ও শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হ'ত। কাচ প্রাচীন কালে যে-সব কাজে আসত সে-সব এখনও বাতিল হয়ে যায় নি, কিন্তু বর্তমানে কাচ এত বেশীরকম কাজে লাগে যে তুলনায় আগের গুলো অকিঞ্চিৎকর। কাচ ব্যবহারের প্রসারের অনেকখানির জন্য দায়ী হস্তচালিত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বর্তমান শতাব্দীতে প্রচলিত স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রবর্তন। এখন বোতল, জার, গেলাস, চিমনি, বাল্ব, বেতারের ভ্যাল্ভ প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে কলে। কাচের ভারি জিনিস চুল্লির মধ্যে ছাঁচে ঢালাই করে তৈরি করা হয়। চুল্লির মধ্যে প্রয়োজনীয় বস্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-সাহায্যে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষাগারে সাধারণ ব্যবহার্য কাচপাত্রের সবই প্রায় কলে তৈরি।

অনেকগুলি মূল্যবান ভৌত গুণের অধিকারী হওয়ায় নানা ব্যবহারিক কাজে কাচ নিয়োজিত হয়। এই গুণগুলির কয়েকটি হল ঃ মাঝামাঝি উচ্চ উষ্ণতায় কাচকে ইচ্ছামতো যে-কোন আকার দেওয়ার সুবিধা এবং ঠাণ্ডা হলে এই আকার অবিকৃত থাকা; তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ সম্পর্কে অভেদ্যতা; জল, বায়ু এমন কি ক্ষয়কারী রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে রাসায়নিক স্থায়িত্ব; যান্ত্রিক ও স্থিতিস্থাপক দৃঢ়তা; বৃহৎ উষ্ণতা পরিবর্তন রোধ করার ক্ষমতা; কাঠিন্য; বর্ণালীর বহুল অংশ সম্পর্কে অচ্ছতা; রঞ্জিত হবার প্রচুর ক্ষমতা এবং তড়িৎ-প্রতিরোধকত্ব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে এই সব গুণের প্রত্যেকটি কাচের রাসায়নিক সংযুতির উপর নির্ভরশীল; সংযুতির তারতম্য ঘটিয়ে এগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটান যায়। বস্তুত, এই সব অনুসন্ধানের ফলে কাচের প্রভূত উন্নতিসাধন এখন সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার কর্নিং গ্ল্যাস কম্প্যানির প্রশংসনীয় কাজের উল্লেখ করা যায়। এঁদের গবেষণার ফলে কাচের যান্ত্রিক দৃঢ়তা, উষ্ণতা-সহনশীলতা এবং রাসায়নিক প্রতিরোধকত্ব লক্ষণীয়ভাবে বাড়ান সম্ভব হয়েছে। আশা করি আপনারা সবাই পাইরেক্স কাচ সম্পর্কে জানেন। ক্যালিফর্নিয়ার প্যালো-মার মানমন্দিরের ২০০-ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট কাচ-দর্পণটি সুষ্ঠুভাবে ঢালাই ও কোমলায়-নের ব্যাপারে কর্নিং গ্ল্যাস কম্প্যানির বিরাট কীর্তিও সম্ভবত আপনাদের অজানা নয়।

শ্রী মোরে কাচনির্মাতার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে যে কেবলমাত্র যথেষ্ট অবহিত তাই নয়, কাচনির্মাণ বিষয়টি সম্পর্কেও তিনি গভীরভাবে আগ্রহশীল। কাচের বিভিন্ন

গুণ সম্পর্কে সকল প্রাপ্ত তথ্যের নিয়মিত উপস্থাপন ও বিচার তাঁর বইয়ে পাওয়া যায়। ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে এমন প্রায় বিশটি ভৌত বিশেষত্ব পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। সাধারণ সুপরিচিত পণ্য কাচ সম্পর্কে তথ্য ছাড়াও কয়েকটি পরীক্ষামূলক বিশেষ কাচ সম্পর্কেও তথ্য দেওয়া হয়েছে। শেষোক্ত কাচগুলির সংযুতি সরল; সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিষয় বিশদ করবার জন্যই সেগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে। যে-সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তার অধিকাংশই ওয়াশিংটনস্থ ভূপদার্থ-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে লেখক এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে। বইটির ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে, পুস্তকটি শ্রী মোরের চোদ্দ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের ফল। বইটি পড়লে এই উক্তিতে আর বিস্ময় লাগে না।

কাচের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে শেষ অধ্যায়ে। ক্ষুদ্রতম হলেও এই অধ্যায়টি সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ কাচের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় মূল প্রশ্ন সম্পর্কে গত দুই দশকব্যাপী ব্যাপক গবেষণা সত্ত্বেও প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো মেলে নি। দুটি প্রাকৃতিক বস্তু—অব্‌সিডিয়ান ও গ্র্যানিটের মধ্যে তুলনা দ্বারা সমস্যাটির সাধারণ প্রকৃতি বোঝান যেতে পারে। রাসায়নিক বিচারে দুয়ের সংযুতি প্রায় একরূপ, কিন্তু গঠনে ও গুণাবলীতে তারা সম্পূর্ণ পৃথক। সকলেই জানেন, গ্র্যানিট স্থূলভাবে কেলাসিত শিলা; এর উপাদান—কোয়ার্ট্‌জ, ফেল্‌স্‌পার ও অভ্রের কণিকা শুধু চোখেই দেখা যায়। অপর পক্ষে, অব্‌সিডিয়ান গঠনবিন্যাসহীন অনিবন্ধী পদার্থ। ফেল্‌স্‌পার, কোয়ার্ট্‌জ বা অভ্রের মতো বস্তুর কেলাসে, পারমাণবিক কণিকাগুলো নির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাসে সজ্জিত থাকে। এক্স-রশ্মি পরীক্ষায় এই বিন্যাস সুন্দরভাবে লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে, কোন অনিবন্ধী বস্তু বা কাচে পরমাণু-কণিকার বিন্যাস এমন যে তাদের এক্স-রশ্মি লেখ ও তরল পদার্থের লেখের প্রকৃতি এক। কাচের গঠন সম্পর্কে আধুনিকতম মত এইঃ বস্তুটি অক্‌সিজেন পরমাণুর মধ্যস্থতায় পরস্পর-সংযুক্ত সিলিকন পরমাণুর বিশৃংখল জালক—যেন এলোমেলোভাবে তৈরি ত্রিধাবিস্তৃত মশারি। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুসমূহ এই জালের রন্ধ্রের মধ্যে স্থান করে নেয়। জালকের আকৃতিতে কোথাও নিয়মিত অনুবর্তন না থাকায় কাচের গঠন অনিবন্ধী। এই যে ছবি দেওয়া হ'ল তা থেকে দেখা যায় যে কাচের গড়ন বিশৃংখল বটে কিন্তু তার ভিত্তিটা কিছু দুর্বোধ্য নয়। এ থেকে আরও সূচিত হয় যে কাচ সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুতির অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবিক, একথা সুবিদিত যে বিস্তৃত সীমার মধ্যে কাচের রাসায়নিক সংযুতির পরিবর্তন করা চলে। সবচেয়ে ভাল কাচ—কোয়ার্ট্‌জ বা কাচীয় সিলিকা গলিয়ে যা পাওয়া যায়—বিশুদ্ধ সিলিকন ডাইঅক্‌সাইড। দুঃখের বিষয়, এই কাচ দিয়ে কিছু তৈরি করা কঠিন এবং এর দামও যথেষ্ট বেশী, সুতরাং বিশেষ ধরনের প্রয়োজনে মাত্র ব্যবহার করা চলে।

শ্রী মোরে রচিত পুস্তকখানি যে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মূল্যবান প্রকাশন এবং যে গ্রন্থমালার অন্তর্গত তার খ্যাতি যে তা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে,

সেটুকু বোঝাবার পক্ষে আমি যথেষ্ট বলেছি। উত্তেজনা সৃষ্টি করবার মতো কিছু বইটিতে নেই ; এই জাতীয় প্রয়োগবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তকে কেউ তা আশাও করেন না। বইটি থেকে পাঠক যে শিক্ষা পান তা হ'ল এই ঃ শিল্পে প্রকৃত সাফল্যের পথ বিচার-বিবেচনাহীন হঠাৎ কিছু করার মধ্য দিয়ে নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আবেগপুষ্ট অচঞ্চল কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে।

১২। নভোবিদ্যুৎ

আরব্য রজনীর কাহিনীতে আমরা এক ধীবরের গল্প পড়েছি। ধীবর সমুদ্রে জাল ফেলে, জাল তুলে পেল একটি প্রকাণ্ড পিতলের ঘট; ঘটের মুখ বন্ধ সীসার ঢাকনা দিয়ে এবং তাতে রাজা সলোমনের মোহর আঁকা। সেই ঘটের ভিতরে কি আছে দেখতে কৌতূহল হওয়ায়, ধীবর ঢাকনাটি খুলে ফেলল, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বিশাল এক দৈত্য যার পা মাটিতে আর মাথা গিয়ে ঠেকেছে মেঘে। দৈত্য তখনি নৃশংসভাবে ধীবরকে হত্যা করবে ব'লে ভয় দেখাল। ধীবর কিন্তু কৌশল করে তাকে আবার ঘটের মধ্যে পুরে দিয়ে ঘটের মুখ বন্ধ করে নিরাপদ হ'ল। তখন ধীবরের আদেশ না মেনে দৈত্যের আর উপায় রইল না।

দৈত্য এবং ধীবরের এই কাহিনীটিকে মানুষ কিভাবে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ বশ করতে শিখেছে সেই সম্পর্কে একটি রূপক মনে করা যেতে পারে। অদমিত থাকলে এই সব শক্তি বিপদ ও ধ্বংসের কারণ হতে পারে, কিন্তু একবার বশীভূত হলে মানুষের ইচ্ছামতো তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তড়িৎ আজ আমাদের বশংবদ দাস—সহস্ররকম কাজ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করছে। এই বিস্ময়কর ঘটনা আমরা নিতান্ত সামান্য বলে গণ্য করি, এ সম্বন্ধে কিছু ভাবারও প্রয়োজন বোধ করি না। বিজ্ঞানের পথিকৃৎরা একদা অজানার সাগরে জাল ফেলে অনেক সময় জীবন সংশয় করেও নব নব জ্ঞান জালে তুলেছিলেন বলেই এই বিস্ময় আজ সম্ভব হয়েছে।

তড়িতের প্রাচীন ইতিহাস অতি মনোহর কাহিনী। সুবিখ্যাত মার্কিন রাজ-নীতিবিদ ও দার্শনিক বেন্‌জামিন ফ্র্যাংক্‌লিন এই ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ করেন তার ইতিবৃত্ত এই ইতিহাসের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়গুলির অন্যতম। তড়িৎবিজ্ঞান সম্পর্কে ফ্র্যাংক্‌লিনের প্রথম অনুরাগ জন্মায় ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে, তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর। এ বিষয়ে তিনি যে বহুসংখ্যক পরীক্ষা করেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত পরীক্ষাটি সংঘটিত হয় ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে, যখন তিনি বিদ্যুৎ-ঝটিকার সময়ে আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে ঘুড়ির সুতায় আটকান চাবি থেকে তড়িৎ-স্ফুরণ মুক্ত করতে সমর্থ হন। তিনি পূর্বে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে মেঘের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ও পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত তড়িৎ-মোক্ষণের প্রকৃতি এক, কেবল শেষেরটি মাত্রায় অনেক কম। এই পরীক্ষায় তাঁর ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হ'ল। তখন থেকে নভো-বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় গবেষণা সমান উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানী-পরম্পরায় চলে আসছে। এমন কি, প্রায় দুই শতাব্দী পার হওয়ার পরেও বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ আজও নিঃশেষিত হয় নি; বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘে তড়িতের যে প্রচণ্ড প্রকাশ দেখা যায় তার কার্যকারণ আজও আলোচনা ও গবেষণার বস্তু।

নানা ব্যবহারিক বিচার কিংবা নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল যে-কোন দিক থেকেই বজ্রপাত সম্পর্কে অনুসন্ধান সমান চিত্তাকর্ষক। বজ্রপাতের ধ্বংসক্রিয়া সবাই জানেন।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানে বেন্‌জামিন ফ্র্যাংক্‌লিনের সবচেয়ে পরিচিত দান হ'ল তাঁর এই সংকেত যে সূক্ষ্মাগ্র ধাতব দণ্ড সাহায্যে গৃহাদি বজ্রপাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এই নির্দেশ অবলম্বিত হতে একটুও দেরী হয় নি। বজ্রপাত তড়িৎ-সরবরাহকারী তারের সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনে বাধা দেয় এবং বেতার-সম্প্রচারে বিঘ্ন ঘটায়। বজ্রপাত বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার আর একটি কারণ হ'ল, বায়ুমণ্ডলের বৈদ্যুতিক অবস্থা এবং আবহ-ঘটনার সংগে বজ্রপাতের সম্পর্ক আছে।

বজ্রপাতের সংগে পরীক্ষাগারে সংঘটিত তড়িৎ-মোক্ষণের তুলনাকালে একথা ভুললে চলবে না যে প্রকৃতির ক্রিয়ার মাত্রা বিশাল। এমন অনেক যন্ত্র তৈরি হয়েছে এবং পদার্থবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণাগারে ব্যবহৃত হচ্ছে যেগুলো কয়েক নিযুত ভোল্ট চাপে তড়িৎ উৎপাদন করে এবং কয়েক গজ দীর্ঘ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ঘটায়। এ পর্যন্ত পরীক্ষণাগারে উৎপন্ন সবচেয়ে দীর্ঘ তড়িৎ-মোক্ষণের তুলনায় আকাশে সংঘটিত বিদ্যুৎ-পাত সহস্রগুণেরও বেশী। সুতরাং বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘের অভ্যন্তরে এই বিরাট বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার কেমন করে হয়, সে প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে।

বিদ্যুৎ-স্ফুরণ যে-সব মেঘের মধ্যে ঘটে, পর্যবেক্ষণে জানা গেছে সে-সব মেঘের অভ্যন্তরে বায়ু দ্রুত উপর দিকে সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চরণ তড়িৎ-মেঘের বিশেষত্ব এবং স্পষ্টত এই সঞ্চরণই মেঘের বিভিন্ন অংশ থেকে বিদ্যুৎ পৃথকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে, যে-কোন কারণেই হ'ক ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ যদি একজাতীয় তড়িতের আধিক্য বহন করে নিয়ে যায়, তা হলে মেঘের নিম্নতর অংশে অপর জাতীয় তড়িতের প্রাচুর্য ঘটবে এবং মেঘের এক অংশ থেকে অপর অংশে তড়িৎ পৃথকীকরণ ও পরিবহণের ফলে দুই অংশ বিপরীতভাবে আহিত হবে। এইভাবে তড়িৎ-চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকবে, বায়ুর তড়িৎ-প্রতিরোধ ভেঙে পড়বে এবং মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎপাত ঘটবে।

তড়িৎ-মেঘের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ-পরিবহণ ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে যদি আমরা মনে রাখি যে ক্ষুদ্র জলকণিকার চেয়ে বৃহত্তর জলকণিকা দ্রুততর বেগে পড়ে; এমন কি যথেষ্ট ছোট হলে কণিকাগুলো তো পড়েই না, বরং বায়ুপ্রবাহের সংগে উপরে উঠে যায়। কাজে কাজেই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে যদি কোন কারণে বড় কণিকাগুলো এক জাতীয় তড়িতের আধিক্য সঞ্চয় করতে পারে তাহলে তাদের নিম্নাভিমুখী গতির সংগে সংগে সেই তড়িৎও পরিবাহিত হবে; তেমনই, ছোট কণিকাগুলোয় অপর জাতের তড়িতের আধিক্য সঞ্চিত হবে এবং তাদের ঊর্ধ্ব-গমনের সংগে তড়িতের পৃথকীকরণ ক্রিয়া দ্রুততর হারে ঘটতে থাকবে।

বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘের অবস্থা অনুযায়ী ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহে সঞ্চরণশীল জলকণিকাসমূহ, তাদের আকার এবং সঞ্চরণের দিকের উপর নির্ভরশীল তড়িদাধান কেমন করে সংগ্রহ করে, সে বিষয়ে বহু চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা সহ দুটি পৃথক মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন সর্ জর্জ সিম্‌সন ও অধ্যাপক সি টি আর উইলসন। এই মতবাদ দুটির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কোন আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই, কারণ

দুটিই বিচারাধীন মনে করা যেতে পারে। দুই বিরোধী মতবাদ উপস্থাপিত হওয়ায় যোগ্যতার মতটির নির্ধারণ-প্রচেষ্টায় বেধশালার ভিতরে এবং বাইরে নানা পরীক্ষা করবার প্রেরণা পাওয়া গেছে। যেমন, বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘের অভ্যন্তরে তড়িতের পৃথকী-করণ বাস্তবিক কতখানি ঘটেছে তার পরিমাণ এবং মেঘের ভিতরে ও বাইরে তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রাবল্য পরিমাপের ব্যাপক চেষ্টা হয়েছে।

বিদ্যুৎপাতের প্রকৃতি ও স্থিতিকাল এবং স্ফুরণ-ক্ষেত্রের মধ্যে ঘটমান বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া-সমূহ সম্বন্ধে সম্প্রতি অতীব চিত্তাকর্ষক গবেষণা যথেষ্ট হয়েছে। একটি উপায় হ'ল অত্যন্ত দ্রুতধাবমান ফোটোগ্রাফ-ফিল্মের উপর বিদ্যুৎ-স্ফুরণের আলোক-চিত্র তোলা। প্রায় একই পথ ধরে যে পৃথক পৃথক স্ফুরণ ঘটে এই উপায়ে সেগুলো সহজেই আলাদা করা যায়। অধিকন্তু, ফিল্মের গতি যদি যথেষ্ট দ্রুত হয়, তাহলে প্রত্যেকটি স্ফুরণের ক্রমবিকাশ এবং প্রতিটি শাখাস্ফুরণের কাল-পারম্পর্য নির্দিষ্ট করা সম্ভব। যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণকে আমরা বজ্রপাত বলি তার সংঘটনের ক্রমপর্যায় সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা স্পষ্টতর ধারণা এই সব পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে। স্থানীয় তড়িৎ-ক্ষেত্রের পর্যালোচনায়, ফোটোগ্রাফির আনুসঙ্গিক হিসাবে ক্যাথাড-রশ্মি কম্পনলেখের ব্যবহার স্ফুরণকালে সংঘটিত বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াসমূহের কাল-পারম্পর্য বিষয়ে অনেক নতুন আলোকপাত করেছে।

যে মতবাদের প্রণেতা অধ্যাপক সি টি আর উইলসন সেটি মেনে নিলে বজ্রপাত-সম্পর্কীয় তড়িৎ বিষয়ে ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। এই মতবাদ অনুসারে, পৃথিবীর পরিমণ্ডলে—এমন কি পরিস্কার আবহাওয়াতেও—যে তড়িৎ-ক্ষেত্র বর্তমান এবং যথেষ্ট প্রবল হওয়া সত্ত্বেও যা সাধারণত আমাদের গোচরে আসে না, সেই ক্ষেত্র বলবৎ থাকে পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে সর্বদাই যে বিদ্যুৎপাত ঘটছে তার উপর। বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতন তড়িৎ-পরিবাহক স্তরের অবস্থা স্বভাবতই নিচেকার যে স্তরে বিদ্যুৎপাত ঘটে তার অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হবে।

একটি মধ্যম আকারের বিদ্যুৎপাতে যে তড়িৎ-শক্তি বিমুক্ত হয় তার পরিমাণ বিশাল—পৃথিবীর বৃহত্তম তড়িৎ-উৎপাদন কেন্দ্র যে-পরিমাণ শক্তি সঞ্জাত করে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী। বজ্রপাত অবশ্য খুশিমতো ঘটানো যায় না; সে কথা বাদ দিলেও বজ্রপাতের শক্তিকে কাজে লাগানর চেষ্টা বাঘ জুতে ঘোড়ার গাড়ী চালাবার চেষ্টার সামিল। এই প্রসঙ্গে জনৈক উজ্জ্বলভবিষ্যৎ তরুণ পদার্থবিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ছে। বিদ্যুৎপাতের শক্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তিনি আল্পস পর্বতের একটি উপত্যকায় গিয়েছিলেন। তাঁর অনুসন্ধান সফলও হয়েছিল, কিন্তু যে প্রবন্ধে তাঁর গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হয় তার সঙ্গেই ছাপা হ'ল তাঁর মৃত্যুসংবাদ। তিনি বিজ্ঞানের বেদীমূলে একজন শহীদ সন্দেহ নেই। নির্মল আকাশে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তাকে কাজে লাগাবার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু উল্লেখ করবার মতো কোন ফল এপর্যন্ত পাওয়া যায় নি। নভোবিদ্যুতের ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্ভাবনা বিশেষ আশাপ্রদ বলে বোধ হয় না।

১৩। আধুনিক পদার্থবৈজ্ঞানিক ধারণা : কেলাসের গঠন

সকল বিজ্ঞানের মধ্যে যে একটি মূলগত ঐক্য বর্তমান তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এই যে কেলাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বহু বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধানকারীদের প্রচেষ্টার ফলে লব্ধ। বিষয়টি বিশেষভাবে খণী অভিযাত্রী ও ভূতত্ত্ববিদদের কাছে, যাঁরা বিভিন্ন মণিকের পরিন্যাস আবিষ্কার করেছেন, সুগঠিত কেলাস সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে সাধ্যের মধ্যে এনে দিয়েছেন যাতে অন্য বিজ্ঞানীরা কেলাসের গুণাবলী সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে পারেন।

কেলাসের যে-সব আকার কেলাসতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয় সে-সবের নমুনার জন্য বহু ক্ষেত্রেই তাঁকে এ'দের সহায়তার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ধাতুবিদের চুল্লি ও মুচি এবং রাসায়নিক-নির্মাতার কেলাসন-পাত্র থেকেও কেলাসিত বস্তুর চমৎকার নিদর্শন অনেক সময় পাওয়া যায়। সাধারণত কেলাসিত অবস্থায় পাওয়া যায় না এমন বস্তু সম্পর্কে গবেষণায় এই সব সহায়তা ছাড়াও গবেষককে স্বয়ং সচেষ্ট হতে হয়। প্রয়োজনীয় আকারের একক কেলাস পাবার জন্য যে-সব উপায় অবলম্বিত হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটি হ'ল: গলিত বস্তুর মন্থর কঠিনীভবন, দ্রবণ থেকে নিয়ন্ত্রিত কেলাসন এবং একাধিক রূপে কেলাসিত বস্তুর উপর উপযুক্ত তাপীয় প্রক্রিয়ার প্রয়োগ।

কেলাসের পল বা তলগুলো সুগঠিত হলে, আন্তস্তলীয় কোণ পরিমাপ করে, এবং প্রয়োজন হলে অন্য পরীক্ষার সহায়তায়, কেলাসতত্ত্ববিদ কেলাসের প্রতিসাম্য-শ্রেণী নির্ণয় করতে পারেন। তাত্ত্বিক বিচারে প্রতিসাম্য-শ্রেণীর সম্ভাব্য সংখ্যা ৩২ ; পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে প্রকৃতিতে ৩২টি শ্রেণীই বর্তমান। এই ৩২টি শ্রেণী আবার ছয়-সাতটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। যেমন, ঘনক পর্যায়ে পড়ে পাঁচটি শ্রেণী। এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে প্রভেদ প্রতিসাম্যের প্রকারের সংখ্যার এবং একটি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ঘনক কেলাসের পক্ষে বৃহত্তম প্রতিসাম্য-সংখ্যার চেয়ে কম। কেলাসে লক্ষিত তলের সংখ্যা ও প্রকৃতি থেকে কেলাসের প্রতিসাম্য-শ্রেণী সাধারণত স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন, ঘনক পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রতিসাম্যে অন্তত ৪৮টি তল এক ধরনের হওয়া প্রয়োজন ; নিম্নতর প্রতিসাম্যে, ক্ষেত্রহিসাবে এই তলের সংখ্যা হবে ২৪ অথবা ১২। অবশ্য এই রকম বৃহৎ সংখ্যার প্রয়োজন হয় কেবল সর্বাধিক সাধারণ তলের বেলায় এবং যখন সেই তলগুলি ঘনকের তিনটি অক্ষের সংগেই কোণ উৎপাদন করে এবং কোণগুলোর পরিমাণ বিভিন্ন।

একটি কেলাস কোন প্রতিসাম্য-শ্রেণীতে পড়ে তার নির্ধারণ প্রয়োজনীয়, কারণ এটি আভ্যন্তর গঠনের নির্দেশক এবং ভৌত গুণের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং কেলাসের জ্যামিতিবেত্তার কার্য পদার্থবিজ্ঞানী ও রাসায়নবিদ উভয়ের পক্ষে সমান মূল্যবান। যেহেতু ৩২টি প্রতিসাম্য-শ্রেণী আছে, সেহেতু ৩২ প্রকারের ভৌত

আচরণও বর্তমান—একথা মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ঘনক কেলাসের সব দিকেই তাপ-সম্প্রসারণ এবং তাপ-পরিবাহিতা সমান এবং কেলাসের সূক্ষ্ম-গঠনবিন্যাস-নিরপেক্ষ, যদিও সম্ভাব্য পাঁচটি প্রতিসাম্য-শ্রেণীর কোনটিতে কেলাসটি পড়বে তা এই সূক্ষ্ম-গঠনবিন্যাসের উপর নির্ভর করে। বস্তুত, এই ৩২টি শ্রেণীকে আবার অল্প কয়েকটি গণে ভাগ করা যায়। যে-সব আলোচ্য ভৌত ধর্মের দ্বারা কেলাসের আচরণ নিরূপিত হয় তাদের প্রকৃতি অনুসারে এই গণগুলো নির্দিষ্ট হয়—যথা, স্থিতিস্থাপক গুণাবলী পড়ে নয়টি গণে, তাপ সম্প্রসারণ এবং তাপ-পরিবাহিতা পড়ে পাঁচটিতে, ইত্যাদি।

বত্রিশটি প্রতিসাম্য-শ্রেণীর এগারোটিতে প্রতিসাম্য-কেন্দ্র আছে, বাকি একুশটিতে নেই। এই একুশটি শ্রেণীর পনেরোটিতে দক্ষিণ-বা বামাবর্তন গুণ দেখা যায়, বাকি ৬টিতে কোন আবর্তন দেখা যায় না। ভৌত গুণের দিক থেকে কেলাসের গঠনে এই বিশেষত্বগুলির গুরুত্ব আছে। চতুস্তলক ও অষ্টতলকের তুলনামূলক আলোচনা থেকে প্রতিসাম্য-কেন্দ্রের অর্থ পরিস্ফুট হবে। অষ্টতলকে তলের সংখ্যা চতুস্তলকের দ্বিগুণ; অষ্টতলকের প্রতিসাম্য-কেন্দ্র আছে, চতুস্তলকের নেই। দক্ষিণা-বর্তন ও বামাবর্তনের অর্থ এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। যে-সব কেলাসে আবর্তন-গুণ দেখা যায়, তাদের পরমাণুর সজ্জা দক্ষিণাবর্ত বা বামাবর্ত পেঁচের কথা মনে করিয়ে দেয়; অথবা আমরা ভাবতে পারি, সমস্ত কাঠামোর মধ্য দিয়ে একটি ঘোরান সিঁড়ি উঠে গেছে।

কেলাসের গঠনে দক্ষিণাবর্তন বা বামাবর্তন যে রূপে সাধারণত প্রকাশ পায় তাকে আমরা বলতে পারি আলোক-বর্তন। ইক্ষুশর্করা-দ্রবণের মধ্য দিয়ে সমবর্তিত আলো পাঠালে সেই আলোর তল আবর্তিত করার যে গুণ শর্করার আছে, আলোক-বর্তনের ক্রিয়া তার অনুরূপ। যে-সব কেলাস ঘনক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং দ্বিপ্রতিসরণ প্রদর্শন করে, আলোক সম্পর্কে তাদের আচরণ দ্বিপ্রতিসরণের জন্য জটিল হয়ে পড়ে। তৎসত্ত্বেও, উপযুক্তরূপে কর্তিত কেলাস-খণ্ডে সমবর্তন-তলের আবর্তন সহজেই দেখা যায়। সমবর্তিত আলোকের তলের আবর্তন যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় এমন সুপরিচিত কেলাসের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত কোয়ার্ট্‌জ।

যে-সব কেলাসে প্রেষ-তড়িৎ বা তাপ-তড়িৎ রূপ কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ দেখা যায়, তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে-সব কেলাসের গঠন এমন যে প্রতিসাম্য-কেন্দ্র থাকতে পারে না। কোয়ার্ট্‌জ বা টুরম্যালিনের মতো প্রেষ-তড়িৎ-প্রদর্শক কেলাসে যা লক্ষ করা যায় তা হ'ল এই যে কেলাসের কোন পাতের উপর যান্ত্রিক পীড়ন প্রযুক্ত হলে তার পৃষ্ঠগুলোয় তড়িদাধান সঞ্জাত হয়; অপর পক্ষে, পাতটির বিপরীত পৃষ্ঠদুটি তড়িদাহিত করলে যান্ত্রিক পীড়ন উপজাত হয়। এই ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিম্নরূপ অনুমান অনুসারে। এই কেলাসগুলোর পরমাণু তড়িৎ-প্রশম নয়, বরং বিপরীতভাবে আহিত, কোন কোন ক্ষেত্রে নেগেটিভরূপে আহিত; স্থিতিস্থাপক বিকৃতির ফলে অপ্রশমিত তড়িতের দিক্-স্থিতি ঘটবে, ফলে

মুক্ত পৃষ্ঠে তড়িদাধান দেখা দেবে। অনুমানটি প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা আবশ্যক যে বিপরীত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ অকেন্দ্র-প্রতিসম কেলাসমাত্রেই প্রেষ-তড়িৎ বা তাপ-তড়িৎ প্রদর্শন করবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

কোন কেলাসের গঠনে প্রতিসাম্য-কেন্দ্র আছে কি নেই তা নির্ধারণের নিশ্চিততর উপায় বর্ণালীবীক্ষণে কেলাসের আচরণ। একথা সুবিদিত যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা হাইড্রোজেনের মতো কোন দ্বিপারমাণবিক প্রতিসম অণুর কম্পন উনলোহিত বর্ণালীতে শোষণ-রেখা বা নিঃসরণ-রেখা রূপে প্রকাশিত হয় না, বরং বস্তু কর্তৃক বিচ্ছুরিত একবর্ণ আলোকের বর্ণালীতে প্রখর সুস্পষ্ট রেখারূপে দেখা দেয়। অণুর কেন্দ্র-প্রতিসাম্য এই তারতম্যের জন্য দায়ী। যে-সব কেলাস-শ্রেণীতে প্রতিসাম্য-কেন্দ্র আছে, সে-সব ক্ষেত্রে ঠিক অনুরূপ অবস্থা দেখা যাবে। পারমাণবিক গঠনের কোন একটি বিশেষ কম্পন যদি উনলোহিত শোষণে প্রকাশ পায় তাহলে বিচ্ছুরিত আলোয় তা থাকবে না। বিপরীত পক্ষে বিচ্ছুরিত আলোয় দেখা গেলে শোষণ-বর্ণালীতে পাওয়া যাবে না। আবার যে-সব কেলাসের প্রতিসাম্য-কেন্দ্র নেই, সেখানে একই কম্পন শোষণ-বর্ণালী এবং বিচ্ছুরণ-বর্ণালীতে দেখা যেতে পারে। বিচ্ছুরিত আলো এবং শোষিত আলোয় কেলাসের বর্ণালীর সম্পূর্ণ মিল কয়েকটি সীমাবদ্ধ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সম্ভব নয়।

যে-সব নিয়মগুলো আলোচনা করা হ'ল, তাদের চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে হীরকে। হীরকের কেলাস ঘনক পর্যায়ভুক্ত। আগেকার যুগের কেলাসতত্ত্ববিদরা যে-সব হীরক পরীক্ষা করেছিলেন তাদের আচরণ চতুস্তলকের মতো। সুতরাং এই ভিত্তির উপর তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে হীরকে ঘনকের নিম্নতম অর্থাৎ চতুস্তলকীয় প্রতিসাম্য মাত্র দর্শিত হয়, পূর্ণ বা অষ্টতলকীয় প্রতিসাম্য দর্শিত হয় না। প্রেষ-তড়িৎ বা তাপ-তড়িতের গুণ না থাকায় বিজ্ঞানীদের মনে পরে এই বিশ্বাস জন্মায় যে পূর্বের ধারণা ভুল এবং হীরকে প্রকৃতই অষ্টতলকীয় প্রতিসাম্য বর্তমান। উনলোহিত শোষণ এবং বিচ্ছুরিত আলোকে হীরকের আচরণ তুলনা করে প্রাচীন কেলাসতত্ত্ববিদদের মতই কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস) কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে দেখান হয়েছে যে অধিকাংশ হীরকই মাত্র চতুস্তলকীয় প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে, যদিও পজিটিভ ও নেগেটিভ চতুস্তলকের পারস্পরিক অন্তঃপ্রবেশের ফলে হীরক অষ্টতলকীয় প্রতিসাম্যের অনুকরণ করতে পারে। কেলাসবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এই অন্তঃপ্রবেশ স্বীকৃত এবং নিতান্ত সাধারণ ঘটনা। আবার এমন হীরাও কিছু আছে যাদের গঠন নিঃসন্দেহে অষ্টতলকীয়। বিশিষ্ট পারমাণবিক কম্পনে উনলোহিত শোষণের অভাব থেকে এটি প্রমাণিত হয়। হীরকের গঠন সম্পর্কে এই যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল, তা এই পরম আশ্চর্য কঠিন বস্তুটির অনেক কৌতূহলোদ্দীপক এবং এযাবৎ অস্পষ্ট আচরণ প্রণিধানের সঙ্কেত জুগিয়েছে।

১৪। আধুনিক পদার্থবৈজ্ঞানিক ধারণা : কঠিন অবস্থা

মিশরদেশে লাক্সরের নিকটবর্তী কারনাকের মন্দিরে একটি একশ'-ফুট দীর্ঘ গ্র্যানিট-স্তম্ভ আছে। স্তম্ভটি স্থাপন করেন রাণী হাৎশেপ্সুৎ, তাঁর পিতা ফারাও প্রথম থথ্‌মেসের রাজত্বকালের স্মারক হিসাবে। আসওয়ানের খনিতে গোটা পাথর থেকে স্তম্ভটি কেটে বার করা হয়েছিল। তারপর দু'শ' মাইল নদীপথে বাহিত হয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি দেবার পর অলঙ্কৃত ও ক্ষোদিত হয়ে স্তম্ভটি যথাস্থানে প্রোথিত হয়েছিল। তিনশ' টনেরও বেশী ওজনের এত বড় একটি বিরাট বস্তুকে স্থানান্তরিত করার মধ্যে প্রয়োগশিল্পের যে নৈপুণ্য দেখা যায় এবং যে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে স্তম্ভটির কারুক্রিয়া এবং মসৃণতা সম্পাদিত হয়েছে, তা স্তম্ভটি স্থাপিত হবার ৩৪০০ বছর পরে আজও আমাদের মধ্যে অসীম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বস্তুটির গুণ এবং আচরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ বিশদ ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকলে এই অপূর্ব কীর্তি কখনই সম্ভব হ'ত না। বাস্তবিক, প্রাচীনকাল থেকে যে-সব শিল্প পরম্পরাগতভাবে বিশেষ উন্নত অবস্থায় আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত তার অনেকগুলোই সম্ভব হ'ত না।

কঠিন বস্তুর আচরণ সম্পর্কে এই যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমরা ঐতিহ্যস্বরূপ পেয়েছি, আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সেই জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কোন কোন ধাতু যে তড়িতের উত্তম পরিবাহী, কোন কোন ধাতুর আবার প্রয়োজনীয় চৌম্বক ধর্ম আছে এবং আরও অনেক বস্তু যে তড়িতের সম্পূর্ণ প্রতিরোধক—এই আবিষ্কারগুলোর উপরেই ভারি বৈদ্যুতিক শিল্প গড়ে উঠেছে। বিশেষ যান্ত্রিক গুণসম্পন্ন নতুন নতুন ধাতুসঙ্করের উৎপাদন গঠনসম্পর্কীয় শিল্পবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করেছে। বিমানপথের অগ্রগতি অনেকখানি সহায়তা পেয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনিসিয়ামের মতো হালকা ধাতু এবং তাদের সঙ্কর আবিষ্কারের ফলে। বীক্ষণ-শিল্প এবং আলোক-চিত্র-শিল্প যে চমকপ্রদ প্রকর্ষে উন্নীত হয়েছে, তার মূলে আছে প্রয়োজনীয় অচ্ছতা, প্রতিসরণাঙ্ক ও আলোক-বিশ্লেষণ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষভাবে নির্মিত কাচের সফল উৎপাদন। কোয়ার্ট্‌জ ও টুরম্যালিনের মতো কেলাসের প্রেষ-তড়িত-উৎপাদন ক্ষমতা একটি দুজ্ঞেয় ধর্ম। যে পদার্থবিজ্ঞানী এই ধর্ম আবিষ্কার করেন বেতারশিল্প তাঁর কাছে অশেষভাবে ঋণী। কঠিন বস্তুর গুণ সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে ফলিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এরকম এত উদাহরণ আছে যে দিয়ে শেষ করা যায় না।

পদার্থের অন্য অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থার প্রভেদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে এর উপাদানিক অণু এবং পরমাণুসমূহের সমবায়গুলোর একটি নির্দিষ্ট দৈশিক বিন্যাস আছে। সন্নিহিত কণিকাগুলোর মধ্যে বলের মাত্রা এমনই প্রখর যে তা সকল

পদার্থে বর্তমান তাপীয় সঞ্চালন প্রতিরোধ করতে পারে; কণিকা-সমবায়গুলির বিন্যাস এবং স্থায়িত্ব এই জন্যই সম্ভব হয়েছে। বস্তুর প্রকারভেদ অনুসারে, পরমাণু-সমবায়ের প্রকৃতি এবং তাদের স্থায়িত্বের জন্য দায়ী বলসমূহের প্রকৃতি এবং প্রাবল্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। মোটামুটি হিসাবে আমরা দু রকমের সমবায় দেখতে পাই: প্রথমটি হ'ল জ্যামিতিক বিন্যাস, কেলাসিত বস্তুর আভ্যন্তর গঠনের যা বিশেষত্ব। দ্বিতীয়টি হ'ল অনিয়মিত বিন্যাস, কাচ বা অনিবন্ধী বস্তুর যা বিশেষত্ব। এই যে প্রভেদের কথা বলা হ'ল তা কেবল আভ্যন্তর গঠন সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; বাহ্যিক আকারের প্রাধান্য বিশেষ নেই। যেমন, এক খণ্ড বরফের বহিরাকৃতির রূপ নিয়মিত নয়, কিন্তু তবুও বরফ একটি কেলাস, অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকগুলি কেলাসের সমন্বয়। জোরাল আলোয় ভাল করে পরীক্ষা করলে এর সত্যতা বোঝা যায়, পৃথক পৃথক কেলাসের সীমারেখাগুলো তখন স্পষ্ট ধরা পড়ে। আরও ভাল হয় বরফের টুকরোটাকে ঘষে যদি একটি অনতিস্থূল পাতের আকার দেওয়া যায়। দুটি সমবর্তকের মাঝে পাতটিকে রেখে কোন আলোর উৎসের দিকে তাকালে চমৎকার রঙের বিন্যাস দেখতে পাওয়া যাবে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বরফ দ্বিপ্রতিসরক কেলাস দিয়ে গঠিত ; একপ্রতিসরক কাচ বা অনিবন্ধী বস্তুর মতো নয়।

যে-সব কঠিন বস্তু নিয়ে ব্যবহারিক জীবনে আমাদের কারবার করতে হয় তাদের অধিকাংশই কেলাসের সমবায়। অনেক সময় শুধু চোখেই তা বোঝা যায়, যেমন গ্র্যানিট বা মর্মর ; অন্যান্য ক্ষেত্রে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায়ও বোঝা যায় না বস্তুটি কেলাসিত কি না ; তখন এক্স-রশ্মি পরীক্ষার শরণ নিতে হয়। অতি স্বল্প আয়তনে এক্স-রশ্মি প্রয়োগ করে যে-সব পদার্থের অণু বা পরমাণুর মধ্যে জ্যামিতিক বিন্যাস পাওয়া যায় না তারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে কাচধর্মী বা অনিবন্ধী। অচ্ছ পদার্থের বেলায় প্রায়ই এর চেয়ে সহজ উপায়ে নির্ণয় করা সম্ভব বস্তুটির অন্তিম গঠন কেলাসিত না অনিবন্ধী। সে উপায়টি হ'ল বস্তুটির উপযুক্ত ছেদ তৈরি করে সমবর্তী অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা। বস্তুটির গঠন কেলাসিত বা অর্ধ-কেলাসিত হলে দ্বিপ্রতিসরণ-নির্দেশক উজ্জ্বল আলোকমণ্ডল দেখা যাবে। এই ধরনের পরীক্ষায় দেখা যায় ভূত্বকের অধিকাংশ শিলা এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহকঙ্কালের প্রায় সকল অংশ কেলাসিত বা অর্ধ-কেলাসিত। অপর পক্ষে, প্রকৃত কাচধর্মী বা অনিবন্ধী বস্তু সমবর্তী অণুবীক্ষণে কাল দেখায়, যদি তা বিশেষভাবে পীড়িত অবস্থায় না থাকে।

কোন কঠিন বস্তুর ভৌত গুণসমূহ বহুলাংশে নির্ণীত হয় বস্তুটির পারমাণবিক বিন্যাস এবং বিশেষত সেই বিন্যাস অবিচল রাখার বলের প্রকৃতি ও পরিমাণ দ্বারা। দুই বা ততোধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে যেভাবে অণু গঠিত হয়, অনুরূপ বলের ক্রিয়ায় যখন অণুগুলো সেইভাবে পর পর যুক্ত হয়ে শৃঙ্খল রচনা করে গোটা কেলাসটি গড়ে তোলে, সেই সব বস্তুগুলো বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই ধরনের কেলাসের উদাহরণ স্বরূপ হীরক, কার্বোর‍্যাণ্ডাম এবং কোয়ার্ট্জের উল্লেখ করা যায়।

জৈব রসায়নে যে বলের ক্রিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, সেই যোজন-বলের সাহায্যে অঙ্গারের পরমাণু সংযুক্ত হয়েছে হীরকে। এখানে অঙ্গার পরমাণুগুলি চতুস্তলকের প্রতিটি অগ্র অনুক্রমে পর পর ক্রমান্বয়ে সংযোজিত হয়েছে যতক্ষণ না সেগুলো কেলাসের সীমানায় গিয়ে পৌঁছেছে। কার্বোরাণ্ডাম কেলাসে অঙ্গার ও সিলিকন পরমাণু একই ভাবে যুক্ত হয়েছে; প্রত্যেক আঙ্গার পরমাণু চারটি সিলিকন পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত এবং প্রতিটি সিলিকন পরমাণু আবার চারটি অঙ্গার পরমাণুর সঙ্গে সংযোজিত। গোটা কেলাসটাই এই ভাবে গড়ে উঠেছে। কোয়ার্ট্জের প্রত্যেক সিলিকন পরমাণু যুক্ত চারটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে এবং প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত দুটি সিলিকন পরমাণুর সঙ্গে। এই নক্শায় গঠিত বস্তুর কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল তীব্র কাঠিন্য, যার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ মেলে হীরায়। এই জাতীয় পদার্থের গলনাঙ্ক উচ্চ এবং এরা জলে বা সাধারণ রাসায়নিক পদার্থে দ্রবণীয় নয়। অপর দিকে আবার এমন সব কঠিন বস্তু আছে যেগুলো গড়ে উঠেছে অণুর সমবায়ে। এসব ক্ষেত্রে যোজন-বলের ক্রিয়া হয়েছে প্রধানত পরমাণুগুলোকে সংযুক্ত করে অণু গঠন করতে; যে সামান্য পরিমাণ বল অবশিষ্ট থাকে অণুগুলোর মধ্যে তা ক্রিয়া করে এবং তাদের সংযুক্ত রাখে। অধিকাংশ জৈব-রাসায়নিক কঠিন পদার্থ এই শ্রেণীতে পড়ে। এরা অল্প উষ্ণতায় গলে, অনেক সময় কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি বাষ্পীভূত হয় এবং উপযুক্ত দ্রাবকে সহজেই দ্রবণীয়। এই প্রকার আচরণের উদাহরণ পাওয়া যাবে কর্পূর, মেন্থল ও ন্যাফ্-থ্যালিনে।

অতীব মনোহারী আর এক শ্রেণীর কঠিন বস্তুর উদাহরণ স্বরূপ স্ফটিক লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের * উল্লেখ করা যায়। তীব্র অম্লের সঙ্গে তীব্র ক্ষারকের রাসায়নিক সংযোগে এই জাতীয় বস্তু গঠিত। এরা প্রায়ই জলে সহজে দ্রবণীয় এবং দ্রবণটি তড়িতের সুপরিবাহী। এই আচরণ ব্যাখ্যার জন্য অনুমান করা হয়েছে যে এ-সব বস্তু তড়িদাহিত পরমাণু বা পরমাণু-গুচ্ছের সমবায়ে গঠিত; পজিটিভ আহিত ক্ষারক পরমাণু-গুচ্ছের চতুর্দিকে আছে নেগেটিভ আহিত অম্লের পরমাণু-গুচ্ছ এবং সেই ভাবে নেগেটিভ আহিত অম্লের পরমাণু-গুচ্ছ বেষ্টিত রয়েছে পজিটিভ আহিত ক্ষারক দিয়ে। দুই বিপরীত ভাবে আহিত পরমাণু-গুচ্ছের তড়িদাকর্ষণের ফলেই বস্তুটি তার কঠিন রূপ পেয়েছে। এই প্রকল্প অনেক ঘটনার সার্থক ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্য না হলেও যথেষ্ট সত্যাসন্ন।

ধাতু এবং ধাতুসংকর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পড়ে। এই সব বস্তুর ব্যবহারিক গুরুত্বের জন্য এদের সম্পর্কে গবেষণাও প্রচুর হয়েছে। এমন সব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যাদের সাহায্যে একটিমাত্র বা অল্প কয়েকটি কেলাসে গঠিত বৃহৎ আকারের বিশুদ্ধ ধাতুখণ্ড পাওয়া সম্ভব। এই রকম নমুনার যান্ত্রিক গুণাবলী ও সাধারণ

* খাদ্য লবণ—অনুবাদক।

অবস্থায় প্রাপ্ত বস্তুটির গুণাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কারণ অবশ্য বোধগম্য, শেষোক্ত ক্ষেত্রে বস্তুটি অগণিত সূক্ষ্ম কেলাসের সমবায়। একক কেলাসের যান্ত্রিক দৃঢ়তা অতি সামান্য এবং যৎসামান্য বল প্রয়োগে তার বিকৃতি ঘটান যায়। প্রত্যেকবার বিকৃতি ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে কেলাসের দৃঢ়তা বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ সাধারণ অবস্থার স্থিত ধাতুর সমান হয়। অনুত্তপ্ত অবস্থায় বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োগে দৃঢ়তা বৃদ্ধি ধাতব পদার্থের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। ধাতুসমূহের ব্যবহারিক কার্যকারিতার মূলে এই গুণটি বর্তমান। উত্তমরূপে কোমলায়িত কোন ধাতুখণ্ড যে-সব বৃহৎ কেলাস দিয়ে গঠিত, সেগুলো অসংখ্য ছোট ছোট কেলাসে ভেঙে গিয়ে অনিয়মিত ভাবে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হওয়ার ফলে ব্যাপারটি ঘটে বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কঠিন বস্তুর প্রকারের যে বর্ণনা দেওয়া হ'ল তা সুসম্পূর্ণ নয়। যেগুলো দুটো শ্রেণীর সীমারেখায় পড়ে, সেগুলোর কোন উল্লেখই করা হয় নি; যাদের আমরা অনিবার্য পদথা বলি তাদের গঠন এবং গুণাবলী সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা করা হয় নি। কৃত্রিম উপায়ে প্ল্যাস্টিক প্রস্তুতকরণের যে শিল্প আজ প্রচুর উন্নতি করেছে, তা আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞানের উৎকর্ষের এক সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত। কেলাসিত ও অনিবন্ধী পদার্থের মধ্যবর্তী বস্তু প্ল্যাস্টিকের বহু প্রয়োজনীয় গুণ আছে। এই সব গুণের মধ্যে একটি হ'ল, ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগে এমন নানা আকার প্ল্যাস্টিকে অনায়াসে দেওয়া যায়।

১৫। আধুনিক পদার্থবৈজ্ঞানিক ধারণা : মহাজাগতিক রশ্মি

মহাশূন্য থেকে এক প্রকার বিকিরণ যে নিয়ত পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে, যার বস্তু ভেদ করবার ক্ষমতা এক্স-রশ্মি বা রেডিয়াম-নিঃসৃত গামা-রশ্মির চেয়ে অনেক বেশী—এই আবিষ্কারটি * করেন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর হেস, ত্রিশ বছরেরও আগে। এই আবিষ্কারের বিরাট তাৎপর্য কিন্তু সে সময় ঠিক বোঝা যায় নি। সত্যি কথা বলতে কি, এই মৌলিক আবিষ্কারের জন্য তাঁকে যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তার জন্য তাঁকে বছর পঁচিশেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ইত্যবসরে এই বিকিরণ বা মহাজাগতিক রশ্মি, তথা পদার্থের উপর তার ক্রিয়া, সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা সবিশেষ উদ্যম সহকারেই মহাজাগতিক রশ্মি-সম্পর্কীয় গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন। অতএব আমরা নিঃসংকোচে আশা করতে পারি যে, যুদ্ধের † শেষে পৃথিবীর বিজ্ঞানীসম্প্রদায় যখন পুনরায় নিয়মিত শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারবেন, তখন মহাজাগতিক রশ্মি-সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে সর্বোচ্চ শ্রেণীর একাধিক আবিষ্কারের কথা জানতে পারব।

এই ভেদক বিকিরণের প্রকৃতি যাই হ'ক না কেন, মহাজাগতিক রশ্মি যে মহা-শূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, সেটি একটি সুনিশ্চিত ঘটনা। যতদূর সম্ভব উঁচুতে বেলুন সাহায্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি পাঠিয়ে বিকিরণের ক্রিয়ার লেখ সংগ্রহ করে হেস স্বয়ং এই ব্যাপারের সত্যতা প্রমাণ করেন। তারপর এই ধরনের পরীক্ষা আরও অনেক হয়েছে। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে যা লক্ষিত হয় তা রশ্মির আসল রূপ অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগের রূপ নয়; বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার পরিণতিস্বরূপ। দশ মীটর ‡ গভীর জলের সমতুল্য সমগ্র বায়ুস্তর ভেদ করবার পরও যে মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়া লক্ষিত হয়, রশ্মির অসাধারণ প্রভেদ্যতার তা চমৎকার পরিচায়ক। এমন কি আরও কিছু দূর পদার্থ ভেদ করবার পরও রশ্মির নির্দেশ মেলে—যেমন দেখা যায় পার্বত হ্রদের বিশ বা ত্রিশ মীটর নীচে।

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশে ঘটনার তুলনামূলক বিচার থেকে বায়ুস্তরে প্রবেশের পূর্বে মহাজাগতিক রশ্মির বাস্তব প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু নির্দেশ পাওয়া

---

* হেসেরে আবিষ্কার হয় ১৯১২ খৃীষ্টাব্দে, তিনি নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩৬ খৃীষ্টাব্দে—অনুবাদক।

† দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—অনুবাদক।

‡ প্রায় ৩৩ ফুট—অনুবাদক।

যায়। এ কথাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে এবং বেলুন সাহায্যে যতটা সম্ভব উ'চুতে ওঠা যায় সেখানে সংঘটিত ঘটনার প্রকৃতি পৃথিবীর অক্ষাংশের উপর নির্ভরশীল। আমরা যদি মনে রাখি যে পৃথিবী নিজেই একটি চুম্বক এবং সেই চুম্বকের বলক্ষেত্র পৃথিবী ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত, যদিও তার প্রাবল্য দূরত্ব অনুসারে ক্রমশ কমে গেছে, তাহলেই অক্ষাংশের প্রভাবের কারণ পাওয়া যায়। এখন আহিত কণিকার স্রোত যদি নানা বিভিন্ন দিক থেকে পৃথিবী অভিমুখে ধাবিত হয়, তা হলে চৌম্বক ক্ষেত্র অতিক্রম কালে তাদের পথরেখা বে'কে যাবে। এই ক্ষেত্র ভেদ করে পরিমণ্ডলের সীমানা পর্যন্ত কণিকাগুলো পে'ছিতে পারবে কি না, তা নির্ভর করবে তাদের গতীর শক্তির উপর। এটা প্রমাণ করা যায় যে স্বল্পশক্তি কণিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে পে'ছিবার সম্ভাবনা বিশেষ নেই, তবে তারা পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলে পে'ছিতে পারবে। এই আলোচনায় আমরা যা দেখছি, অক্ষাংশ অনুসারে রশ্মি-কণিকার আচরণের লক্ষিত প্রভেদ তার সংগে মেলে। সুতরাং, আমরা আনায়াসে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে মহাজাগতিক রশ্মি তড়িদাহিত কণিকার প্রবাহ, কদাচ তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ নয়, কারণ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ঐ বিকিরণকে কোন ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। এ ছাড়া, স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় কণিকাগুলো ঊর্ধ্বাধ রেখার কিঞ্চিৎ বাঁ দিক ঘে'সে আসে। অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কণিকাগুলোর আধান পজি-টিভ এবং সেগুলো সম্ভবত প্রোটন অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর আহিত কেন্দ্রক।

এ কথা সুবিদিত যে কোন দ্রুতধাবমান আহিত কণিকা যখন বাতাসের মতো সাধারণ অবস্থায় তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থ ভেদ করে যায়, সেই পদার্থ তখন আয়নিত হয়ে যায় অর্থাৎ সাময়িকভাবে পরিবাহী হয়ে ওঠে। এক্স-রশ্মি বা রেডি-য়াম-নিঃসৃত গামা রশ্মির মতো উচ্চ কম্পনসংখ্যাবিশিষ্ট বিকিরণের প্রভাবেও অনুরূপ ক্রিয়া ঘটে। এই আয়নন বিকিরণের সাক্ষাৎ ক্রিয়া নয়—অন্য ক্রিয়ার পরিণতি—বিকিরণের সংঘাতে পদার্থের পরমাণু থেকে স্থলিত আহিত কণিকার ক্রিয়া। মহা-জাগতিক রশ্মি পর্যালোচনার জন্য যে-সব উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হয়েছে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দ্রুতগতি আহিত কণিকার আয়নন-ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। উপায়ের সূক্ষ্মবিচার নির্ভর করে কণিকার বেলায় তার শক্তির উপর এবং রশ্মির বেলায় খরতার উপর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে খর গামা রশ্মির ক্ষেত্রে যে ধরনের ক্রিয়া লক্ষিত হয়, এক্স-রশ্মির ক্ষেত্রে তা হয় না। আবার, মহা-জাগতিক রশ্মির ক্ষেত্রে এক একটি কণিকার শক্তি এমন প্রচণ্ড যে তার তুলনায় খরতম গামা রশ্মি অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং গামা রশ্মির পক্ষে যে-সব ক্রিয়া ঘটান সম্ভব নয়, মহাজাগতিক রশ্মির বেলায় আমাদের এমন সম্পূর্ণ নতুন এবং ব্যাপক ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি পর্যালোচনার জন্য যে-সব সুকৌশলী যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাদের মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : এক, স্বয়ংলেখ তড়িৎ-বীক্ষণ—যা আয়নন পরিমাপ করে ; দুই, গাইগার গণক—যা নির্দিষ্ট অবস্থায় কণিকার সংখ্যা

গণনা করে; তিন, উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠ—যা কণিকার পথরেখার উপর শিশিরপাত ঘটিয়ে পথরেখাটি দৃষ্টিগোচর করতে সহায়তা করে। উইলসন প্রকোষ্ঠের সঙ্গে একটি প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র যুক্ত হলে ধাবমান কণিকার পথ বেঁকে যাবে এবং তা থেকে কণিকার গতীয় শক্তির পরিমাণ এবং তার তড়িদাধান পজিটিভ না নেগেটিভ নির্ধারণ করা যায়। উইলসন প্রকোষ্ঠ তিন শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে সব চেয়ে চমকপ্রদ, কারণ এতে কণিকার পথরেখা চোখে দেখা যায় এবং তার ফোটোগ্রাফও নেওয়া যায়। ঝাঁক ঝাঁক কণিকার আশ্চর্য ছবি পাওয়া গেছে এবং প্রকাশিত হয়েছে। এই সব ছবিতে কণিকাগুলোর পথ ভিন্ন ভিন্ন দিকে বেঁকে গেছে এবং কণিকার শক্তি অনুসারে বৃত্ত-পথগুলোর ত্রিজ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। অ্যান্ডারসন কর্তৃক পজিট্রন * অর্থাৎ পজিটিভ তড়িদাহিত ইলেকট্রনের আবিষ্কার এবং পদার্থের উপর তড়িৎ-চৌম্বক রশ্মির সংঘাতে যুগপৎ পজিট্রন ও ইলেকট্রনের উদ্ভবের প্রমাণ এই উপায়েই হয়েছে। তথাকথিত ভারি ইলেকট্রন বা মেসনের ‡ অস্তিত্ব সর্বপ্রথম সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় এই উপায়ে। মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকা এবং পদার্থের সঙ্গে তার সংঘাতে জাত অপর কণিকাদের পথরেখা নির্ধারণের আর একটি উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্যাপারটি নিতান্ত সরল—বিশেষভাবে প্রস্তুত পুরু আস্তরণ-বিশিষ্ট ঢাকা দেওয়া ফোটোগ্রাফের প্লেট দীর্ঘ সময় রশ্মির ক্রিয়ায় রেখে দেওয়া। এই উপায় অবলম্বন করে বহু অতি চমৎকার ছবি পাওয়া গেছে।

গাইগার গণক অতীব কুশলী এবং শক্তিশালী যন্ত্র এবং মূলত উপযুক্ত গ্যাস বা বাষ্পপূর্ণ বেলনাকার নল, যে নলের অক্ষদেশে একটি সরু টাংস্টেন তার আছে। কোন আয়ননকারী কণিকা এর মধ্যে প্রবেশ করলে তা বন্দুকের ঘোড়ার মতো কাজ করে এবং একটি তড়িৎ-স্ফুরণ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটির পূর্বাবস্থা আপনই ফিরে আসে এবং আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে পরবর্তী কণিকার প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। রিলে ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা এই স্ফুরণগুলো পৃথক ভাবে অথবা পুঞ্জ অনুসারে যন্ত্রসাহায্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ায় জাত অপর কণিকাদের উদ্ভবের ঘটনাসংস্থান, প্রভেদ্যতা এবং গতির দিক নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন ভাবে সংযুক্ত অনেকগুলি গাইগার গণকের সজ্জা ব্যবহৃত হয়। বস্তুত, সমসূত্রে স্থাপিত কয়েকটি গাইগার গণক মহাজাগতিক রশ্মির উপযোগী দূরবীক্ষণ রূপে নিয়োজিত হয়েছে। আমার তরুণ বন্ধু শ্রীবিক্রম সরাভাই বাঙ্গালোরে মহাজাগতিক রশ্মি গবেষণার জন্য যেমন যন্ত্রাদি সজ্জিত করেছেন সে রকম যে-কোন গবেষণা-গৃহে প্রবেশ করলে গণকযন্ত্রের যে বিরামহীন টিক টিক ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় তা মহাজাগতিক রশ্মির সর্বব্যাপকতা জাজ্জ্বল্যমানরূপে দর্শকের মনে ছাপ রেখে যায়।

---

* পজিট্রন আবিষ্কৃত হয় ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে, পৃথক ভাবে অ্যান্ডারসন ও ব্ল্যাকেট দ্বারা—অনুবাদক।

‡ জাপানী বিজ্ঞানী য়ুকাওয়া ১৯৩৫ অব্দে তত্ত্ববিচারে মেসনের অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ পান। পরীক্ষণ দ্বারা মেসনের অস্তিত্ব প্রথম সপ্রমাণ করেন অ্যান্ডরসন ও নীডারমায়ার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে—অনুবাদক।

কোন কোন হিসাবে মহাজাগতিক রশ্মি-সম্পর্কীয় গবেষণা ও পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য পরীক্ষণমূলক গবেষণার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। অবশ্য কিছু কাজ সাধারণ পরীক্ষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে সম্পাদন করা চলে, যদিও তার ক্ষেত্র খানিকটা সীমাবদ্ধ। মহাজাগতিক-রশ্মি-বিজ্ঞানীকে অভিযাত্রী, পর্বতারোহী, বৈমানিক, স্তরমণ্ডলগামী বেলুন-আরোহী, প্রভৃতি নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। তাঁকে যন্ত্র বহন করে নিয়ে যেতে হয় ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে কিংবা অনেক উঁচুতে, কোথায় কি ঘটছে জানবার জন্য। যেখানে যাওয়া সম্ভব নয় এমন দুরধিগম্য বা উঁচু জায়গার জন্য যন্ত্রসজ্জা নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে। এই যন্ত্রসজ্জা এমন হওয়া চাই যে তা সহজে বহন করা যাবে এবং পর্যবেক্ষণের ফল হয় আপনিই লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে, নয়তো তা থেকে এমন ভাবে সংকেত প্রেরিত হবে যার অনুলিপি ভূমিতে অবস্থিত যন্ত্রে ধরে রাখা যাবে সুযোগসুবিধা মতো পর্যালোচনার জন্য। এই ধরনের যন্ত্রবাহী বেলুন স্তরমণ্ডলে প্রেরণ করা মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে গবেষণার একটি সাধারণ ব্যবস্থা। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় মূল কণিকাগুলোয় শক্তির রূপান্তরের প্রকৃতি উদ্ঘাটনে এই উপায়টি যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

হিসাব করে পাওয়া যায় যে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পূর্বে মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার শক্তি কয়েক শত কোটী ইলেকট্রন-ভোল্ট। সে জায়গায় পরীক্ষাণাগারে সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন যে কণিকার সৃষ্টি করা যায় তার পরিমাণ পাঁচ কোটী ইলেকট্রন-ভোল্টের বেশী নয় *। সুতরাং এ কথা বোঝা যায় যে মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণা, জ্ঞানের এমন নব নব পথ খুলে দিয়েছে, অন্য উপায়ে যা অনধিগম্য ছিল। এই বিশাল শক্তিসম্পন্ন কণিকাগুলো কোথা থেকে আসে, কোথায় এবং কেমন করে তাদের সৃষ্টি হয়, সে তত্ত্ব আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। এ বিষয়ে অবশ্য বহু জল্পনাকল্পনা হয়েছে কিন্তু সেগুলির আলোচনায় কোন লাভ নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই কণিকাগুলি যে-সব সমস্যার অবতারণা করেছে মানবের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সেগুলি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এইসব সমস্যার সমাধান হ'লে, আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে বাস করি তার প্রকৃতি ও উদ্ভব সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিকটতর হবে।

ইলেকট্রন-ভোল্ট। ব্রুকভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটারিতে এই বছরেই এমন একটি যন্ত্র সম্পূর্ণ হবার কথা যার শক্তি হবে ৩০০০ কোটী ইলেকট্রন-ভোল্ট —অনুবাদক।

* বর্তমানে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০) সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্রের সীমা ৬০ কোটী

১৬। নক্ষত্রজগৎ

নির্মেঘ অন্ধকার রাত্রে আমরা আকাশে তারার মেলা দেখতে পাই; তাদের কয়েকটি প্রোজ্জ্বল, তার চেয়ে কিছু বেশী সংখ্যক স্বল্পোজ্জ্বল এবং বহুসংখ্যক ক্ষীণ। আকাশে সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু হ'ল ছায়াপথ। অসম মেখলার মতো বিস্তৃত ছায়াপথের কোন কোন অংশ বেশী স্পষ্ট, যেমন ধনুরাশিতে দেখা যায়। শুধু চোখে আকাশের যেটুকু দেখা যায়, ভাল দ্বিনেত্র দূরবীণের ভিতর দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী দেখা যায়। অস্পষ্ট আলোর ছটা দেখা যাবে অসংখ্য পৃথক তারার সমষ্টিরূপে; শুধু চোখে যা দেখা যায় না বললেই চলে সেই তারকাপুঞ্জ বা নীহারিকা স্পষ্ট বোঝা যাবে। যত জোরাল দূরবীণ ব্যবহার করা হবে আমাদের দৃষ্টির প্রসারও তত বাড়বে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান মানমন্দিরে যে-সব বিশাল দূরবীণ ব্যবহৃত হয়, তারা—বিশেষ করে তাদের সাহায্যে তোলা ফোটোগ্রাফ—আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে তার মহিমা অতুলনীয়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইয়ে আকাশের যে-সব আলোকচিত্র দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে যে-সব যন্ত্র সাহায্যে এই ছবি তোলা গেছে তাদের শক্তির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ডের সমীক্ষণ এবং তার গঠন, বিস্তৃতি ও ইতিহাস নির্ধারণ হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান সমস্যা। এই সব জিজ্ঞাসার নিরসনের জন্য পৃথিবীর প্রধান মানমন্দিরগুলো এবং শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আত্মনিয়োগ করেছেন অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এই প্রচেষ্টার ফলে তথ্যের তথা তাদের ব্যাখ্যার একটি ভাণ্ডার ক্রমশ গড়ে উঠেছে। শেষ কথা না হলেও এই ব্যাখ্যা চিত্তাকর্ষক ও ইঙ্গিতপূর্ণ এবং যতখানি নিঃসংশয় প্রমাণের উপর নির্ভরশীল ততখানি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানেও পর্যবেক্ষিত তথ্যের অসংখ্য খুঁটিনাটি এবং জটিল গণনা ও আলোচনার প্রয়োজন হয়। যাঁদের বৃত্তি জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁরা ছাড়া এর অধিকাংশের মূল্যবিচার বা উপলব্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু পর্যবেক্ষিত ঘটনাসমূহ ও তাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মূলকথা সাধারণ জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর বোধগম্য না হবার কোন কারণ নেই।

নাক্ষত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের বৃদ্ধিবৃত্ত অনুধাবনের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যালোচনায় অবলম্বিত উপায়গুলি সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা। তারারা যে আলো দেয় বলে আমরা তাদের দেখতে পাই, সেই আলোর পর্যালোচনার ভিত্তির উপরই সমগ্র জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য, অজ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আসল অনুরাগের ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন ও তজ্জনিত পরিতৃপ্তি। বিশ বছর আগে ক্যালিফর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে যে দুটি রাত্রি যাপন করেছিলাম তার স্মৃতি আমাকে গভীর আনন্দ দেয়। অসামান্য সৌভাগ্যক্রমে—অন্তত আমার তো তাই মনে হয়—আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না বলে মানমন্দিরের বিরাট দূরবীণ নিয়মিত কাজে লাগান সম্ভব হয় নি; ফলে আকাশের দৃশ্য দেখবার সুযোগ আমার ঘটে গিয়েছিল। এখানকার ষাট ও একশ-ইঞ্চি ব্যাস-

বিশিষ্ট সুবৃহৎ প্রতিফলক দূরবীক্ষণের আলোক সংগ্রহের ক্ষমতা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিই। কালপুরুষ নক্ষত্রে অবস্থিত নীহারিকা সাধারণ দূরবীণে দেখায় খানিকটা আকারহীন উজ্জ্বল আলোর মতো, আর ৬০-ইঞ্চি দূরবীণে দেখায় নানা রঙে রঙীন দীপ্ত আলোকমালার মতো। নীহারিকার উপাদানিক গ্যাসসমূহের আলোক বিকিরণের উপর এই রঙগুলো নির্ভর করে।

বৃত্তিগত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন নিতান্ত গৌণ। তাঁদের কাজের প্রধান উপকরণ ফোটোগ্রাফিক প্লেট, যাতে উপযুক্ত উন্মোচন ও আলোকন-কাল সাহায্যে নক্ষত্ররাজির আলোকচিত্র লিপিবন্ধ হয়ে থাকে। এ জন্য অবশ্য নক্ষত্রের আপাত আহ্নিক গতি নিরাকৃত করে নক্ষত্রের বিম্ব প্লেটে নিশ্চল রাখা প্রয়োজন। এর উপায় যন্ত্রটিকে নক্ষত্রের সেই আপাত আহ্নিক গতির সঙ্গে সমভাবে চালনা করা। নক্ষত্রের বিম্ব যাতে অস্পষ্ট না হয় বা আলোকরেখায় পর্যবসিত না হয়, সেজন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা কতদূর নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যায়—বিশেষ করে আমরা যদি আধুনিক দূরবীণের বিশালতার কথা স্মরণ রাখি। ফোটোগ্রাফিক প্লেটের প্রধান সুবিধা এই যে যে-সব বস্তুর আলো এত ক্ষীণ যে শুধু চোখে দেখা যায় না, প্রয়োজনানুসারে আলোকন-কাল বাড়িয়ে তাদেরও ছবি তোলা যায় এবং সুযোগসুবিধামতো পর্যালোচনা করা চলে। দূরবীক্ষণের কল্যাণে মহাশূন্যে অন্তঃপ্রবেশ এই উপায়ে বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আলোকচিত্রণের সহায়তায় এইভাবে নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান ও আপাত ঔজ্জ্বল্য নির্ণয় করা যায়। বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের পক্ষে সংবেদনশীল প্লেট ব্যবহার করে নক্ষত্রের বর্ণও নিরূপণ করা যায়। কিন্তু নক্ষত্র-বিকীর্ণ আলোকের পর্যালোচনায় সেই আলোকের বর্ণালী অধিকতর সহায়ক। এজন্য বর্ণালীবীক্ষণকে হয় দূরবীণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়, নয় তো তার এক বিশেষ অঙ্গরূপে নির্মাণ করতে হয়। দেখা যায় যে সকল তারার বর্ণালী ঠিক এক রকম নয়; তাদের মধ্যে এত প্রভেদ যে বর্ণালীগুলো দশটি শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়েছে। নক্ষত্রের চক্ষুগ্রাহ্য বর্ণ ও বর্ণালীর এই তারতম্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শুধু রঙ থেকে নক্ষত্রের ভৌত গুণ সম্পর্কে আমরা যতটা জানতে পারি, তার চেয়ে অনেক বেশী পারি তার বর্ণালী পর্যালোচনায়।

পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা যায়ঃ এক, অন্য নক্ষত্রের তুলনায় কোন বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থান; দুই, তার আপাত ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণ; তিন, তার বর্ণালীর শ্রেণী। কোন কোন নক্ষত্রের লম্বন দেখা যেতে পারে। সূর্য পরিভ্রমণে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য শূন্যে নক্ষত্রের যে আপাত গতি দেখা যায় তাকে বলা হয় লম্বন। নক্ষত্রের দূরত্ব যত বাড়বে তার লম্বনের পরিমাণ সেই অনুপাতে কমে যাবে। দৃষ্টিরেখার লম্বভাবে নক্ষত্রের গতি থাকতে পারে; সেক্ষেত্রে তারকাপুঞ্জের মধ্যে কালক্রমে তার স্থানান্তর ঘটবে। এ ছাড়া দৃষ্টিরেখার সমসূত্রেও নক্ষত্রের গতি থাকতে পারে। নক্ষত্রের ফোটোগ্রাফিক মানচিত্রে কিন্তু তা ধরা পড়ে

না ; তার বর্ণালীর সুপরিচিত প্রমাণ রেখাগুলোর লাল বা বেগুনি প্রান্তের দিকে অপসরণ বা ড্যোপ্‌লার চ্যুতি থেকে এই গতি অনুমান করে নিতে হয়। নক্ষত্রের এই প্রকৃত বা আপাত গতি ছাড়া অনেক সময় তার আপাত ঔজ্জ্বল্যেরও তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। এই তারতম্য নিয়মিত ও পর্যাবৃত্ত হতে পারে কিংবা অনিয়মিতও হতে পারে। পর্যাবৃত্ত তারতম্যের কারণ দুটি: যৌগিক তারার নিয়মিত পারস্পরিক ভ্রমণকালে একটি কর্তৃক অপরের গ্রাস, অথবা কোন তারার অভ্যন্তরে নিয়মিত সঙ্কোচন-প্রসারণ। এ ছাড়া, নক্ষত্রের বর্ণালীর মধ্যেও পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এটি বিশেষভাবে লক্ষিত হয় তরুণ তারার বর্ণালীতে। অনিয়মিতদীপ্তি তারার বর্ণালীর মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু সেই পার্থক্য অপেক্ষাকৃত সামান্য। কোন তারার আপাত ঔজ্জ্বল্য ও প্রকৃত বা পরম ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। এই দুয়ের পরিমাণ কিন্তু ঠিক এক নয়, কারণ আমাদের থেকে তারার দূরত্ব অনুসারে আপাত ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যার গুরুত্ব আছে সেটি প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য, আপাত ঔজ্জ্বল্য নয়।

নক্ষত্র সম্পর্কে একটি প্রধান ও আবশ্যকীয় প্রশ্ন তাদের ব্যাসের কোণীয় মান পরিমাপযোগ্য কি না। শুধু চোখে দেখলে অনুজ্জ্বল তারার চেয়ে উজ্জ্বল তারা বড় মনে হয়, কিন্তু এটি দৃষ্টিভ্রম। সেই রকম ফোটোগ্রাফেও উজ্জ্বল তারার চেয়ে অনুজ্জ্বল তারা ছোট দেখায়। এটাও এক প্রকার ভ্রান্তি, যদিও এর একটি সুবিধা আছে; তারার আপাত ঔজ্জ্বল্যের মান এর সাহায্যে সহজে নির্ণয় করা যায়। বাস্তবিক, সকল তারার—অবশ্য সূর্যকে বাদ দিয়ে—কোণীয় মান এত কম যে দূরবীণে তারার বিম্ব থেকে ধরা বা মাপা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ব্যতিকরণ-মান যন্ত্রের সাহায্যে নাক্ষত্র ব্যাসের কোণীয় মান নির্ণয়ের একটি উপায় মাইকেলসন উদ্ভাবন করেছিলেন।

কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে আর্দ্রা নামে যে বিশাল তারাটি আছে, সেটির বেলায় এই উপায় সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেল এর ব্যাসের কোণীয় পরিমাণ বিকলার বিংশ ভাগ। তারাটির দূরত্ব তার স্বল্প লম্বন থেকে নির্ণয় করা যায়। দূরত্ব ও ব্যাসের কোণীয় মান থেকে হিসেব করে পাওয়া গেল আর্দ্রার ব্যাস ২৪ কোটী মাইলের মতো বিস্ময়কর (অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়) সংখ্যা।

কোন তারার দূরত্ব নিরূপণের সবচেয়ে সরাসরি উপায় তার বার্ষিক লম্বন নির্ণয় দ্বারা। দূরত্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারার কোণীয় মানও হ্রাস পায়; বহুদূরস্থিত নক্ষত্রের কোণীয় মান এত অল্প যে আর মাপা যায় না। পরিমাপযোগ্য লম্বন-বিশিষ্ট নক্ষত্রের সংখ্যা নগণ্য। সেই তুলনায় যে-সব তারার অস্তিত্ব শুধু বিশাল দূরবীণ সাহায্যে তোলা ফোটোগ্রাফে ধরা পড়ে, তাদের সংখ্যা অপরিমেয়। নক্ষত্র-জগতের পরিসর যে কত বিরাট, তা বোঝা যায় অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নক্ষত্ররাজির

লম্বনের স্বল্পতা ও দূরস্থিত নক্ষত্রসমূহের লম্বনের নগণ্যতা থেকে। প্রত্যন্তস্থিত নক্ষত্র ও নক্ষত্র-পরিবারের দূরত্বের অন্তত মোটামুটি ক্রম নির্দেশের কয়েকটি উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। বিষয়টি পরবর্তী আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হ'ল। নক্ষত্রময় ব্রহ্মান্ডের গঠন সম্পর্কে যে-সব সাধারণ ধারণা বর্তমানে পোষণ করা হয়, সে বিষয়ে সামান্য নির্দেশ মাত্র এখানে দিচ্ছি।

সূর্য একটি তারা, কিন্তু আকারে বা ঔজ্জ্বল্যে বড় নয়। সূর্যের নিকটবর্তী তারা ও নক্ষত্রপুঞ্জ—দূরবীণ দিয়ে দেখলে যা পৃথক পৃথক তারার সমষ্টি বলে বোঝা যায়—এই নিয়ে হল আমাদের স্থানীয় পদ্ধতি। এটি আবার ছায়াপথ-রূপ বিশাল নক্ষত্র-পরিবারের অংশমাত্র। ছায়াপথের যে-সব অংশ দেখা যায় তাদের ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া হয়েছে: ছায়াপথ আকৃতিতে পেঁচানো নীহারিকার মতো এবং ধনু রাশিতে যে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা যায় তা এর ঘনীভূত কেন্দ্রভাগ। আমাদের এই নক্ষত্র-পরিবার পেরিয়ে অবিশ্বাস্য রকম দূরে দূরে বিশালসংখ্যক নক্ষত্র-পরিবার রয়েছে। প্রকান্ড দূরবীণ সাহায্যে তোলা আলোকচিত্রেই মাত্র এদের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের নক্ষত্র-পরিবারের বাইরে, শুধু চোখে দেখা যায় এমন নক্ষত্র-পরিবার একটিই আছে—সুবিখ্যাত অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা। এটি যে তারার সমষ্টি তা উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন দূরবীণ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

১৭। নক্ষত্রজগৎ (অনুবৃত্তি)

সূর্য একটি তারা মাত্র, কিন্তু পরবর্তী নিকটতম তারার চেয়ে অনেক কাছে থাকায় দেখায় সবচেয়ে বড় আর উজ্জ্বল। দূরবীণের মধ্যে সূর্যের যে বৃত্তটি দেখা যায়, তার ঔজ্জ্বল্য কেন্দ্রদেশে সবচেয়ে বেশী, প্রান্তের দিকে ক্রমশ কম। সূর্যের দীপ্ত পৃষ্ঠকে বলা হয় আলোকমণ্ডল। এর দীপ্তি সমসর্বত্র নয়। মাঝে মাঝে কাল দাগ বা সৌর কলঙ্ক এবং ধারের দিকে তীব্রোজ্জ্বল রেখার মতো দেখা যায়। এই রেখাকে বলা হয় ফ্যাকুলা *। সৌর কলঙ্ক ও ফ্যাকুলার আচরণ নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষিত হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ অনেক প্রয়োজন সাধন করে, যার একটি হ'ল সূর্যের আবর্তন-কাল নিরূপণ।

একটি সাধারণ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের ছিদ্রের উপর সূর্যের বিম্ব ফেললে নিরবচ্ছিন্ন উজ্জ্বল বর্ণালী পাওয়া যায়, আর দেখা যায় বহুসংখ্যক কাল রেখা এই বর্ণালীকে ছেদ করেছে। এদের বলা হয় ফ্রাউনহোফার রেখা। সৌর পৃষ্ঠের কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে প্রান্ত, এমন কি প্রান্ত ছাড়িয়েও কিছু দূর পর্যন্ত, প্রত্যেক অংশের বর্ণালীর সযত্ন পর্যবেক্ষণে বর্ণালীগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। এই সব ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আলোকমণ্ডলের বর্ণালী নিরবচ্ছিন্ন এবং সেই আলো বিরল বাষ্পীয় পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় শোষিত হবার ফলে ফ্রাউনহোফার রেখাগুলোর উদ্ভব হয়। এই ক্রিয়ার জন্য দায়ী বলে এই পরিমণ্ডলকে প্রত্যাবর্তী স্তর বলা হয়। আলোকমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আছে বর্ণমণ্ডল—এর বর্ণালী রেখাময়। বর্ণমণ্ডলের বর্ণালী পরীক্ষার সবচেয়ে ভাল সুযোগ পাওয়া যায় সূর্যের পূর্ণগ্রাসের কয়েক মিনিট সময়ে। বর্ণমণ্ডলের পরে আছে সৌর উৎসেধ এবং তার পরে সৌর কিরীট। উৎসেধগুলোর ঔজ্জ্বল্য মাঝামাঝি ; কিরীট তার চেয়ে অনেক ম্লান। সূর্যের পূর্ণগ্রাসের সময় উৎসেধ ও কিরীট শুধু চোখেই দেখা যায়। সৌরবর্ণালী-লেখ নামে বিশেষ যন্ত্রের সহায়তায় পূর্ণগ্রাস ছাড়া অন্য সময়েও উৎসেধের ফোটোগ্রাফ তোলার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। সম্প্রতি ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিও এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন করেছেন যাতে যে-কোন সময়ে উচ্চ পর্বতচূড়া থেকে সৌর কিরীট, অন্তত তার নিম্নাংশের আলোকচিত্র তোলা যায়।

সূর্য এবং তার পরিমণ্ডলে লক্ষিত ঘটনাবলীর নিয়মিত পর্যালোচনা একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্তাকর্ষক। পৃথিবীপৃষ্ঠের আবহ-অবস্থা স্বভাবতই সৌর বিকিরণের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করবে। একাদশ বর্ষব্যাপী সৌর-কলঙ্ক-চক্র ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ায় যে চক্রানুযায়ী পরিবর্তন ঘটাবে তার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। সৌর কিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহু উচ্চ স্তরের অবস্থায়ও যথেষ্ট

---

* শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে, অর্থ ক্ষুদ্র মশাল—অনুবাদক।

পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনের জন্যই বেতার তরঙ্গ পৃথিবীপৃষ্ঠের বক্রতা অনুসরণ করে চলতে পারে। কেবল পৃথিবীর অনেক প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে বলেই যে সৌর ঘটনার আলোচনার সার্থকতা আছে তা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকেও তা যথেষ্ট মূল্যবান, কারণ এ থেকে আমরা বুঝতে পারি অন্য তারায় কি ঘটছে। দূরবর্তী তারাগুলো আমাদের কাছে দেখায় আলোকবিন্দুর মতো, সুতরাং কোন তারার সমগ্র আলোই একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কিন্তু সূর্যের বেলায় তার প্রত্যেক অংশের আলো পৃথকভাবে পর্যালোচিত হতে পারে। এই অনুসন্ধান বিশেষভাবে ফলপ্রদ হয়েছে, বহু আশ্চর্য—চমকপ্রদও বলা যায়—ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়েছে। আমি মাত্র একটির উল্লেখ করছি। জর্জ ই হেল আবিষ্কার করেছেন যে সৌর কলঙ্কের অভ্যন্তরে এমন প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে যা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে বহু সহস্রগুণ শক্তিশালী। বর্ণালীর পর্যবেক্ষণেই এই চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। সৌর কলঙ্কের মধ্যে প্রবল তড়িৎ-প্রবাহ বা অনুরূপ কিছু আছে এই অনুমানেই মাত্র এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সূর্য থেকে আমরা মোট কতখানি শক্তি পাই তার পরিমাণ এবং সূর্যের বর্ণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার থেকে আমরা সূর্যপৃষ্ঠের উষ্ণতা নির্ণয় করতে পারি। হিসাবে দেখা যায় এই পরিমাণ ৬০০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড—সবচেয়ে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুল্লিতেও যে উষ্ণতা পাওয়া যায় না। এই উষ্ণতা খুব বেশী মনে হয় বটে, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসাধারণ মনে করলে ভুল হবে। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই উষ্ণতা নিতান্তই সূর্যপৃষ্ঠের ; অভ্যন্তরে যত এগোন যাবে উষ্ণতাও তত প্রচণ্ডভাবে বাড়বে, এ কথা মনে করার বহু সঙ্গত কারণ আছে। সূর্য তথা অন্য নক্ষত্রের আভ্যন্তর উষ্ণতা বিজ্ঞানীরা কি করে নির্ণয় করেন তা বোঝাতে হলে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বহু গূঢ়তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করা প্রয়োজন ; ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষও বটে। সুতরাং সে চেষ্টায় বিরত থাকলাম। হিসাবে পাওয়া যায় এই উষ্ণতা কয়েক নিযুত সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রির মতো। এই পরিমাণ এমনই বিশাল যে অলীক জল্পনা বলে বোধ হয়। একথা অবশ্য সত্য যে সূর্য বা নক্ষত্রের আভ্যন্তর উষ্ণতা সরাসরি মাপবার কোন উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই গণনার ভিত্তি পদার্থবিজ্ঞানের সুপরিজ্ঞাত মূলনীতিসমূহ ও সযত্নসম্পাদিত গাণিতিক অনুসন্ধান, সুতরাং এটুকু ভরসা করা যায় এই গণনা অন্তত সত্যের প্রত্যাসন্ন।

সূর্যের বর্ণালীর সঙ্গে অন্যান্য তারার বর্ণালী তুলনা করলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লক্ষ করা যায়। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি বলেছি, সব তারার বর্ণালী সর্বাংশে এক নয়। বাস্তবিক তাদের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য দেখা যায় যে বর্ণালীগুলোকে অন্তত দশটি শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়, যাদের পরস্পরের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ বর্তমান। পীতবর্ণ নক্ষত্রের বর্ণালীর সঙ্গে সূর্যের বর্ণালীর ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায় ; এদের বর্ণালীতে পাওয়া যায় হাজার হাজার ফ্রাউনহোফার রেখা। নীল তারার বর্ণালী আরও সরল। এদের পরিমণ্ডলের অবস্থা এমন যে বর্ণালীতে শুধু হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের শোষণ-রেখাগুলিই স্পষ্ট; সৌর বর্ণালীতে প্রকট

ভারি মৌলের রেখাগুলি প্রায় অদৃশ্য। যে-সব বিষয়ের ভিত্তিতে নাক্ষত্র বর্ণালীর শ্রেণীবিভাগ নির্ধারিত হয়েছে সে গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে নক্ষত্রদের মধ্যে একটি নিয়মিত ক্রমপর্যায় আছে যার প্রতিটি ক্রম নাক্ষত্র বিবর্তনের এক একটি ধাপ।

আমাদের ঘরোয়া সূর্য যে অবিরত প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ বর্ষণ করছে কোন ভারতবাসীকে তা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য নক্ষত্র আছে, সূর্য তাদের মধ্যে আকার বা ঔজ্জ্বল্যে সর্বপ্রধান নয়। এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কোথায়—এই জিজ্ঞাসা মনে আসা স্বাভাবিক। আমাদের পর্যবেক্ষণে যতটুকু ধরা পড়ে তা থেকে মনে হয় না যে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে শক্তি-নিঃসরণ কিছু হ্রাস পেয়েছে। সূর্য থেকে নিঃসৃত শক্তির মোট পরিমাণ সম্পর্কে প্রায় সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই শক্তির ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেকগুলো গুরুতর অসঙ্গতি দেখা যায়।

বর্তমান বিশ্বাস অনুসারে সূর্য তথা অন্য নক্ষত্র থেকে বিকীর্ণ শক্তির হেতু কয়েকটি মূলগত রাসায়নিক পরিবর্তন, যাদের ফলে নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ মৌলগুলো অন্য মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে তত্ত্ব রচিত হয়েছে। আমি যে নক্ষত্রের ক্রমপর্যায়ের বিষয় আগে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এই তত্ত্বের আপাতত সফল সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এখানে আবার বিরত হলাম, কারণ এ সম্বন্ধে বেশী বলতে গেলে তাত্ত্বিক আলোচনার পাকচক্রে জড়িয়ে পড়তে হবে।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ আশ্চর্য আবিষ্কার এই যে সুদূর নীহারিকাগুলো আমাদের কাছ থেকে তথা পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে বলে বোধ হয়। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি উল্লেখ করেছি যে পৃথিবীর বৃহৎ দূরবীণগুলো অগণিত সংখ্যায় এই সব নীহারিকার অস্তিত্বের সংবাদ আমাদের দিয়েছে। এদের দূরত্ব এমনই বিশাল যে তাদের ফোটোগ্রাফ তুলতেই যথেষ্ট শক্তি-শালী যন্ত্র এবং সুদীর্ঘ আলোকন-কালের প্রয়োজন হয়। এদের বর্ণালীর আলোক-চিত্র নেওয়া আরও কঠিন, যদিও মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০-ইঞ্চি দূরবীণের কল্যাণে তাতেও কৃতকার্য হওয়া সম্ভব হয়েছে। কোন নীহারিকার ক্ষীণতার মাত্রা থেকে তার দূরত্বের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। বহুসংখ্যক নীহারিকায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে গণনা আরও কিছু নির্ভরযোগ্য হবে। এই হিসাব থেকে এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার উদ্ঘাটিত হ'লঃ যে নীহারিকা আমাদের কাছ থেকে যত দূরে আছে তার অপসরণের বেগও তত বেশী। নীহারিকার বর্ণালীতে পরিচিত শোষণ-রেখাগুলো লাল প্রান্তের দিকে সরে যাওয়া থেকে এই বেগের নির্দেশ মেলে। নিকটবর্তী নীহারিকাগুলোর অপসরণ-বেগ সেকেণ্ডে কয়েক শত কিলোমীটর * ;

* এক কিলোমীটর প্রায় ৫/৮ মাইল—অনুবাদক।

আর কিছু দূরে এই বেগ দাঁড়ায় সেকেণ্ডে কয়েক হাজার কিলোমীটর। অত্যন্ত ক্ষীণ দূরতম নীহারিকাগুলোর অপসরণ-বেগ অবিশ্বাস্য রকম প্রচণ্ড—সেকেণ্ডে দশ হাজার কিলোমীটরের মতো বা আরও বেশী।

এই পরিলক্ষিত ঘটনার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। সার্বিক সাপেক্ষবাদ তত্ত্বের মূল ভিত্তির সঙ্গে এই ঘটনার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা হয়েছে। অনেক তত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে ডোপ্‌লার চ্যুতি নির্দেশিত এই অপসরণ বাস্তবিকই ঘটছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে প্রচণ্ড বেগে প্রসারিত হচ্ছে এই মত যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্য কিছু সংখ্যক এমন বিজ্ঞানীও আছেন যাঁরা বর্ণালী-রেখার লোহিত প্রান্ত অভিমুখে চ্যুতির অন্য ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন আলোকের কোন অজ্ঞাত ধর্ম এই চ্যুতির জন্য দায়ী এবং এই সুবিশাল দূরত্ব অতিক্রম কালে সেই অজ্ঞাত কারণে আলোকের কম্পনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই সব গভীর বিতর্কমূলক প্রশ্ন সম্পর্কে আমার নিজস্ব কোন মত প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না।

১৮। পদার্থবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ

পঞ্চাশ বছর পূর্বে লোকান্তরিত কোন কৃতী পদার্থবিজ্ঞানীকে যদি পুনরুজ্জীবিত করে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কীয় কোন বক্তৃতা-সভা বা আলোচনা-চক্রে আমন্ত্রণ করে আনা যায়, তা হলে সে ভদ্রলোকের প্রথম ধারণা হবে, প্রায় সকলেই চূড়ান্ত প্রলাপ বকছে। কেন্দ্রক, আইসোটোপ, কোয়াণ্টাম, ফোটন, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন, প্রভৃতি অনেক শব্দ তাঁর কানে আসবে যা তিনি কস্মিন্‌কালে শোনেন নি। কারও কাছে এ-সব শব্দের অর্থ জানতে চাইলে কেউ হয়তো একটু বাঁকা হাসি হেসে রোষকষায়িত লোচনে তাকাবেন, কেউ বা কর্কশ ভাষায় প্রশ্নকর্তাকে পাঠশালায় ফিরে যাবার সদুপদেশ দেবেন। নিউটনীয় বলবিদ্যা বা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের মতো পুরনো বিষয়ের উল্লেখ মাঝে মাঝে শুনতে পেয়ে বিজ্ঞানীটির মনোভঙ্গ হয়তো একটু প্রশমিত হতে পারে—যদিও এই উল্লেখ হবে খানিকটা দায়সারা গোছের। তিনি কথঞ্চিৎ খুশিও হতে পারেন যখন তিনি জানতে পারবেন যে ম্যাক্সওয়েল প্রবর্তিত আলোকের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের এখনও উচ্ছেদ হয় নি। অবশ্য বিষয়টির উল্লেখ বা আলোচনা বড় একটা হয় না। অধিকাংশ সময় অপর বিজ্ঞানীদের আলোচনার যে-সব বিষয় তিনি শুনতে পাবেন সেগুলো হ'ল—পরমাণু-কেন্দ্রকের বিভাজন, মেসনের ক্ষয়, ভারি কণিকা, মহাজাগতিক রশ্মি বিস্ফোটন, বাক্‌লের সাইক্লোট্রন, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, ইত্যাদি। সমগ্র ব্যাপার-টিই তাঁর কাছে পরম ক্লান্তিকর এবং যারপরনাই বিরক্তিকর মনে হবে, কারণ এই ভাষার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় নেই।

আমি আপনাদের কাছে নব্য পদার্থবিজ্ঞানের এই যে প্রাঞ্জল চিত্র দেবার চেষ্টা করছি, তার উদ্দেশ্য গত দশ বছরে বিজ্ঞানে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার বিশালতা আপনাদের মনে ভাল করে গেঁথে দেওয়া। জ্ঞানের নব নব প্রশস্ত পথ খুলে গেছে ; এর বনিয়াদ খানিকটা নতুন পরীক্ষণভিত্তিক আবিষ্কার এবং কিছু অভিনব তাত্ত্বিক ধারণা। ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিজ্ঞান যে মৃত এমন নয়, নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের সুবিশাল প্রাসাদের ছায়ায় শুধু তা আত্মগোপন করে আছে। এই নব্য পদার্থবিজ্ঞান ব্যাপৃত রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের গঠনপরিশেষে অসংখ্য সূক্ষ্ম চরম সত্তার সন্ধানে—যাদের উল্লেখ আমাদের পুনরুজ্জীবিত বিজ্ঞানীকে বিভ্রান্ত করেছিল। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন, এমন কি জীববিজ্ঞানেরও সমগ্র ঘটনা এই সকল সত্তার পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। এখনকার গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানীর কাজ এই সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুষ্ঠুতম সংকেত গ্রথিত করা এবং তা থেকে সূক্ষ্ম সত্তা-গুলির আচরণের পূর্বাভাস দেওয়া। তেমনই, পরীক্ষণরত পদার্থবিজ্ঞানীর কর্তব্য, পরীক্ষণাগারে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন অবস্থায় এই সত্তাসমূহের প্রতিক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ, গণিতবেত্তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্য নিরূপণ এবং সম্ভব ক্ষেত্রে তাদের আচরণ সম্বন্ধে এযাবৎ অজ্ঞাত নতুন নিয়মের আবিষ্কার। অগ্রগমন এখন এত দ্রুত চলেছে যে নেতৃস্থানীয়

বিজ্ঞানীদের পক্ষেও এত সময় ব্যয় করা সম্ভব নয় যাতে এই নবলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার তাঁদের কাছে সমগ্রভাবে অধিগম্য ও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। অগ্রগমনের মোটামুটি ধারা সম্বন্ধে বড় জোর একটা ভাসাভাসা ধারণা তাঁরা করে উঠতে পারেন। তাঁরা এই প্রার্থনা করেন যেন ভবিষ্যতে আরও একটু ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার মতো দীর্ঘায়ু তাঁরা লাভ করতে পারেন।

এমত অবস্থায় ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে অনাগত কালে কি ঘটবে সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার সম্মান অবিমিশ্র নয়। এই কার্য সত্যই অসম্ভব হ'ত, যদি না পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিশেষ লক্ষণ হ'ত যে তা মূলত, এমন কি প্রধানত, অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান নয়। পদার্থবিজ্ঞান প্রধানত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায়নে প্রযুক্ত গাণিতিক চিন্তাধারার একটি যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। সুতরাং এই বিজ্ঞান মূলগতভাবে ভবিষ্য-সূচক এবং কোন ঘটনা প্রকৃতিতে লক্ষিত হবার পূর্বেই গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগে তার আবিষ্কার সম্ভব। বস্তুত, নব্য পদার্থবিজ্ঞানের একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষণাগারে সমর্থিত হবার পূর্বেই অনেক সম্পূর্ণ মৌলিক আবিষ্কারের পূর্বসূচনা পাওয়া গেছে। এখানে দুটি উদাহরণ দেওয়া হ'লঃ প্রথম, দ্য ব্রগলি কর্তৃক ইলেকট্রনের তরঙ্গাচরণের পূর্বঘোষণা; দ্বিতীয়, মেসনের অস্তিত্বের প্রাগ্‌নির্দেশ। দুই ভবিষ্যদ্বাণীই পরে পরীক্ষণাগারে চমৎকারভাবে সমর্থিত হয়। এ সম্পর্কে সর্বাধুনিক উদাহরণ দিতে গেলে ডক্টর এচ জে ভাভার উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস) কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ডক্টর ভাভা এমন মূল কণিকার অস্তিত্বের অবতারণা করেছেন যার ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান কিন্তু আধান একক আধানের গুণিতক। আমার বিশ্বাস এই সাহসিক ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষণ সাহায্যে সত্বর প্রমাণিত হবে। *

আগেই উল্লেখ করেছি, পদার্থবৈজ্ঞানিক চিন্তার বর্তমান ধারা যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তার লক্ষ্য পদার্থের সূক্ষ্ম গঠন সম্পর্কে গভীরতম উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে নব পারমাণবিক প্রজাতি উৎপাদন ব্যাপারে চমকপ্রদ অগ্রগমন দেখা গেছে। প্রচণ্ড বেগে ধাবমান পারমাণবিক কণিকার সংঘাতে পরিচিত পরমাণু থেকে এই সব নতুন পরমাণু সৃষ্টি হচ্ছে। এই কার্যে নিয়োজিত নানা যন্ত্রের মধ্যে দক্ষতম বোধ করি ক্যালিফর্নিয়াস্থিত বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই ও লরেন্স উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রন। অধ্যাপক লরেন্স ও তাঁর সহকর্মীরা এটি থেকে আশ্চর্য ভাল কাজ পাওয়ায় পৃথিবীর অনেকগুলো প্রধান পরীক্ষণাগারে

---

* ডক্টর ভাভার এই ভবিষ্যদ্বাণীর তারিখ ও পরিণতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে অধ্যাপক রামনকে লেখায় তিনি অনুবাদককে জানিয়েছেন : ডক্টর ভাভার নিবন্ধ প্রকাশিত হয় এপ্রিল, ১৯৪০, কিন্তু তাঁর প্রকাশিত কণিকার অস্তিত্বের কোন সন্ধান অদ্যাবধি মেলে নি।

সাইক্লোট্রন নির্মিত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরি। ডক্টর আর এস কৃষ্ণণ নামে জনৈক তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী সেখানে বিজ্ঞানসাধনায় রত আছেন এবং অনেক চিত্তাকর্ষক ফল পেয়েছেন। প্রকাশ, একটি বিশাল নতুন সাইক্লোট্রন নির্মাণের জন্য রকিফেলার ফাউণ্ডেশন অধ্যাপক লরেন্সকে দশ লক্ষ ডলার দান করেছেন। এ পর্যন্ত নির্মিত সব সাইক্লোট্রনের চেয়ে এটি অনেক বেশী শক্তিশালী হবে। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে বর্তমানে আয়োজিত অনুসন্ধানের ফলে পরমাণুর গঠনরহস্য আর গোপন থাকবে না। গত বিশ বছরের পদার্থবিজ্ঞান যেমন ভাবে পরমাণুর বৈদ্যুতিক বহির্গঠনের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ দিতে পেরেছে, আগামী দশ বছরে তেমনই ভাবে পরমাণুর যা মর্মস্থল এবং তার ভর ও রাসায়নিক ধর্মের নির্ণায়ক, সেই কেন্দ্রকের স্বরূপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে।

ইত্যবসরেই পরমাণু-কেন্দ্রক সম্পর্কীয় জ্ঞানের এমন অগ্রগমন ঘটেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের উপলব্ধি গভীরতর হয়েছে। আকাশে অসংখ্য আলোর বিন্দুরূপে আমরা যাদের দেখতে পাই সেই নক্ষত্রগুলো আসলে এক একটি বিরাট চুল্লি, যার মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে—বোধ হয় কিমিয়া প্রক্রিয়া বললেই ভাল হয়—এক মৌল প্রতিনিয়ত অন্য মৌলে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখন সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রক্রিয়াই নাক্ষত্র শক্তির মূল কারণ। অতএব আশা করা অসঙ্গত হবে না যে পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি গভীরতর হবে।

আগামী দশকে নব্য পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাধারা ও প্রয়োগপদ্ধতি যে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করবে—আমার মতে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসঙ্কোচে করা যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা দেবার মতো গভীরতা ঊনবিংশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানে ছিল না। এই ত্রুটি দূর করেছে নব্য পদার্থবিজ্ঞান। ফলে রসায়নবিদ্যা—অন্তত তার তাত্ত্বিক দিক—শনৈঃ শনৈঃ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু রসায়নকে 'ডাল-ভাতের বিজ্ঞান' বলা চলে, সেহেতু এই বিজ্ঞানের আংশিক অভিজ্ঞতালব্ধ ভিত্তি থেকে প্রকৃত বিজ্ঞানে রূপান্তর মানুষের কল্যাণকর না হয়ে যায় না। জীববিজ্ঞানী অবশ্য স্বীকার করেন যে তাঁর বিশেষ ক্ষেত্রে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। বস্তুত, এই দুই বিজ্ঞান থেকে ধার করা উপায় ও কৌশল জীববিজ্ঞানী হামেশাই ব্যবহার করছেন। বর্তমান প্রবণতা দেখে মনে হয় জীববিজ্ঞান ক্রমশ পদার্থের মূল বিজ্ঞানের নিকটতর হচ্ছে। প্রাণরহস্যের সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন আগামী দশকে ঘটবে এ প্রত্যাশা আমরা অবশ্য করতে পারি না, কিন্তু এটুকু আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি যে প্রাণের ভৌত ও রাসায়নিক ভিত্তি আমরা আরও প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারব।

১৯। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞানের যে-কোন শাখার ভিত্তিস্বরূপ ঘটনা বা ধারণার সঙ্গে তার আবিষ্কারকের নাম যুক্ত করার একটি প্রথা প্রচলিত আছে। বিজ্ঞানের পরিভাষার সংক্ষেপকরণ ও নির্ভুলতা সম্পাদনের সহায়ক হিসাবে প্রথাটি অবশ্যই হিতকর। অধিকন্তু, যে-সব বিজ্ঞাননেতাদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের বিষয় বিশেষ গড়ে উঠেছে, এই ভাবে তাঁদের স্মৃতি থাকে জাগরূক এবং যশ হয় অম্লান। বস্তুত, এই ভাবেই শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের নামের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রথম পরিচয় ঘটে। বিজ্ঞানের অনুশীলনে ব্যক্তি সম্পর্কে এইভাবে যে ঔৎসুক্য জাগে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়, কারণ বিজ্ঞান যে মানবচৈতন্যের এক প্রাণবান ও বর্ধনশীল সৃষ্টি সেই সত্যটি স্পষ্টতরভাবে প্রতিভাত হয়।

বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ এবং তার মর্মসত্যের যথাযথ হৃদয়ঙ্গমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ইতিহাস এবং সেই সব বিভাগের অগ্রগমনে সহায়ক প্রধান বিজ্ঞানীদের জীবনকাহিনীর আলোচনা অপরিহার্য। এই জাতীয় রচনা পাঠে যে আনন্দ ও উদ্দীপনা পাওয়া যায়, কোন নিছক বৈজ্ঞানিক পুস্তক—তা যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হ'ক না কেন—কখনই আমাদের ততখানি উপভোগ্য হয় না। এই জাতীয় ইতিবৃত্ত ও জীবনেতিহাসের উপকারিতা শিক্ষকের কাছে যথেষ্ট। অধ্যাপনার সময় ছাত্রদের মনোযোগ যখন শিথিল হয়ে আসে, শিক্ষক তখন তাঁর অধ্যাপনার বিষয়ীভূত কোন একটি আবিষ্কার কি করে ঘটেছিল সেই বিবরণ কিংবা কোন বিজ্ঞানী সম্পর্কিত ব্যক্তিগত কাহিনী শুনিয়ে তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে পারেন। অধ্যাপক এইভাবে শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে দিতে পারেন বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে ওঠে. তাদের হৃদয়ঙ্গম করাতে পারেন যে বিজ্ঞানের উপজীব্য বৃদ্ধিবৃত্ত দৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাকে বলে ? কেমন করে তা সংঘটিত হয় ? এই প্রশ্নগুলো প্রায়ই করা হয় ; এ সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই। প্রশ্নের উত্তরে বহু বিচিত্র কথা শোনা গেছে। এ কথা অনায়াসেই বোঝা যায় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয় কোন নতুন ঘটনা নয়তো কোন অভিনব ধারণা। বিজ্ঞানে অব্যাখ্যাত পর্যবেক্ষণের যে বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, একথা অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। তেমনই, ঘটনা দ্বারা অসমর্থিত ধারণাও মূল্যহীন। সুতরাং সত্যকার তাৎপর্য থাকতে হলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তাত্ত্বিক ও পরীক্ষণমূলক দুটো ভিত্তিই থাকা প্রয়োজন। এর কোন দিকটার গুরুত্ব বেশী তা আবিষ্কার বিশেষের অবস্থার উপর নির্ভর করবে। এই আলোকে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—তত্ত্বভিত্তিক ও পরীক্ষণভিত্তিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ র‍্যাণ্টগেন কর্তৃক এক্স-রশ্মি অবিষ্কারকে নিঃসঙ্কোচে পরীক্ষণভিত্তিক শ্রেণীতে ফেলা যায়। তেমনই, প্লাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকণিকা সম্পর্কীয় আবিষ্কার স্পষ্টত তত্ত্বভিত্তিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

যে উপায়ে অনুসরণে আবিষ্ক্রিয়া ঘটে এবং গবেষকের যে মনোভঙ্গির সহায়ে এই সংঘটন সম্ভব হয়, দুই শ্রেণীর আবিষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ পৃথক হতে বাধ্য। পরীক্ষক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর প্রতিন্যাসের এই প্রভেদ গণিতভিত্তিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক। যে-সব বিজ্ঞান প্রধানত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং যেখানে ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে তদ্বিষয়ক চিন্তার পৃথকীকরণ অনায়াসসাধ্য নয়, সে-সব ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত প্রভেদ খুব স্পষ্ট হতে পারে না।

আবিষ্ক্রিয়া শব্দটির মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় দ্যোতনা আছে—চষা জমিতে পাঁচিশ-রতি হীরকখণ্ড লাভের মতো। বিজ্ঞানের ইতিহাস এইরূপ নাটকীয় আবিষ্কারের কাহিনীতে পূর্ণ। কোন আবিষ্কার ঘটবার অব্যবহিত পরমুহূর্তে আবিষ্কর্তার আচরণে এই উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় অভিব্যক্তি বিশেষভাবে দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের জীবনে এমন দু-একটি ঘটনার কাহিনী আমি আপনাদের শোনাতে পারি। এ বিষয়ে সবচেয়ে পুরনো ও পরিচিত কাহিনী আর্কিমিদেস সম্পর্কে। তাঁর নামের সংগে যুক্ত উদস্থিতিবিজ্ঞানের প্রখ্যাত সূত্রের রূপটি যে মুহূর্তে তাঁর মনে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় স্নানপাত্র থেকে বেরিয়ে তিনি 'এউরেকা, এউরেকা' (পেয়েছি, পেয়েছি) বলে চিৎকার করতে করতে পথে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন। কাহিনীটির মর্মকথা এইঃ সদ্য-উপলব্ধ ধারণার গুরুত্ব এমন তীব্র প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে যে আবিষ্কর্তার মন সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে যায়। এমন মুহূর্তে যে তীব্র আনন্দ ও ভাবোচ্ছ্বাস অনুভূত হয় তা অনির্বচনীয়। অবশ্য প্রগাঢ় নিষ্ঠাসম্পন্ন বিজ্ঞানসাধকের জীবনেও এমন নাটকীয় ক্ষণ জীবনে দু-এক বারের বেশী আসে না। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানসাধনায় সমগ্র জীবন পাত করার এগুলো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে আরও ঘন ঘন; আবিষ্কর্তার পক্ষে এমন আবিষ্কার পরিতৃপ্তিদায়ক ও উৎসাহবর্ধক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলো এমন হৃদয়স্পর্শী নাটকের অবতারণা করে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহৎ আবিষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সেই কীর্তি সব সময়ে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সংগে বিজ্ঞানীসমাজে গৃহীত হয় না। কীর্তিটির গুরুত্ব লাঘব করবার জন্য বিচারবিবেচনাশূন্য বা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রায়ই যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন তা হ'ল এই মত প্রকাশ করা যে আবিষ্ক্রিয়াটি নিতান্তই আকস্মিক ঘটনার ফল—লটারি জেতার মতো নেহাৎ কপালজোরে পাওয়া। আকস্মিকভাবে আবিষ্ক্রিয়া ঘটতে পারে, এই ধারণার নিরসন হওয়া প্রয়োজন, কারণ ব্যাপারটি যদি সত্যিই আকস্মিক হয়, তাহলে সেটি ঘটে শুধু যোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেই, অন্যত্র ঘটে না কেন? প্রত্যেক সফলকাম বিজ্ঞানী আপন নির্বাচিত বিষয়ে জ্ঞান ও সত্যের সন্ধানী—এর কোন ব্যতিক্রম নেই। নতুন কোন সত্যের কণিকাও একদিন পাবেন, এই প্রত্যাশাই তাঁকে প্রেরণা যোগায়। যে-সব ভাষ্যকার মনে করেন, আবিষ্ক্রিয়া আকস্মিক ব্যাপার, তাঁরা ভুলে যান যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সব চেয়ে বড় কথা, পর্যবেক্ষক কর্তৃক ঘটনার স্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা; সেই ক্ষমতা ব্যতিরেকে এবং বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয়

জ্ঞানের অভাবে এই প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব নয়। বস্তুত, সযত্নকল্পিত কার্যসূচীর অনুসরণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া কদাচিৎ ঘটে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন ঘটে—অবশ্য যদি তা ঘটে—তখন দেখা যায় যে তা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বছরের পর বছর নিয়মিত পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানের ফল।

যেখানে মৌলিক পরীক্ষাভিত্তিক নূতন আবিষ্ক্রিয়ার স্বীকৃতিই অনেক সময় বিলম্বে আসে, সেখানে অভিনব তাত্ত্বিক ধারণার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি যে আরও বিলম্বে আসবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই সব ধারণার ভাগ্যে প্রায়ই যা মেলে তা হ'ল উপেক্ষা বা সন্দেহ। পর্যবেক্ষিত তথ্যের সুদৃঢ় প্রতিপোষণ সহ বহুবর্ষব্যাপী নিরলস স্বমতসমর্থন ব্যতীত আবিষ্কর্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর ধারণার সাধারণ স্বীকৃতি পাবার আশা করেন না। আরেনিউস ও তাঁর ডক্টরেট থীসিসের কাহিনী এই ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। দ্রবণের প্রকৃতি সম্পর্কে অভিনব ধারণাসম্বলিত প্রচুর পরীক্ষালব্ধ তথ্যসমর্থিত তাঁর এই নিবন্ধ দেওয়া হয়েছিল স্কটহল্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের বিনিময়ে তিনি পেলেন এক চতুর্থ শ্রেণীর উপাধি—যা তাঁকে বঞ্চিত করল অধ্যাপনার অধিকার থেকে। সৌভাগ্যের বিষয় আরেনিউস এই তিক্ত অভিজ্ঞতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। পরিশেষে তিনি নোবেল পুরস্কার পান এবং স্বদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে সকলের শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করেন। পরিতাপের বিষয় এই যে তরুণ প্রতিভার অবদমন, এমন কি সম্পূর্ণ নিরোধের এমন অনেক দৃষ্টান্ত বর্তমান।

বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুধাবন করলে একটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়—মহৎ আবিষ্ক্রিয়া ও তরুণ প্রতিভার মধ্যে একটি আশ্চর্য যোগাযোগ আছে। এই উক্তির সমর্থক দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত, বিজ্ঞানের যে-কোন শাখা নিয়ে যদি এমন একটি বই লেখবার চেষ্টা করা যায় যাতে তরুণ বিজ্ঞানীদের দান সম্পর্কে কিছু সন্নিবেশিত হবে না, তাহলে দেখা যাবে লেখার মতো বস্তু বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। এ বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্য বোধ হয় এইঃ অন্যান্য ব্যাপারে সমতুল্য ধরে নিলে, সার্থক বিজ্ঞান-গবেষণার প্রধান প্রয়োজন বয়স ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরিপক্কতা নয়, প্রয়োজন তরুণ দৃষ্টিভঙ্গির স্বভাবসিদ্ধ সজীবতা ও নবীনতা। অতএব দেখা যাচ্ছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যে রক্ষণশীলতা দেখা দেয়, বিজ্ঞানে মহতী কীর্তি স্থাপনের তা পরিপন্থী। বোধ হয় মহৎ ধারণা তরুণ মনে সহজেই জাগ্রত হয়। কিন্তু, যেহেতু কোন নবজাত ধারণার যথাযোগ্য ও সম্পূর্ণ রূপায়ন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ, সেই হেতু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বয়স এবং অভিজ্ঞতা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন এমন কথা বলা যায় না। বয়োবৃদ্ধির ফলে যে রক্ষণশীলতা জন্মায়, নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বরং তা হিতকর, কারণ সেই রক্ষণশীলতা তরুণ মনের উদ্দাম চিন্তার আতিশয্য অনেকাংশে প্রশমিত করতে পারে। আরও কথা, ইচ্ছা থাকলে প্রবীণ ব্যক্তিও তরুণের প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করতে পারেন। অতএব, প্রবীণ বিজ্ঞানীরা তাঁদের বয়ঃসঞ্জাত রক্ষণশীলতা যতদিন তরুণ বিজ্ঞানীদের নিরোধে প্রয়োগ

যা করছেন, ততদিন তাঁরা গবেষণার পথনির্দেশক ও অনুপ্রেরক রূপে হিতকর কার্যে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীণ বিজ্ঞানীদের প্রধান কর্তব্য তরুণদের মধ্যে প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাদের নিরঙ্কুশ বিকাশ ও বর্ধনে সহায়তা করা।

কেন মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ জন বিজ্ঞানের অনুরাগী হন এবং কেনই বা বিজ্ঞানের সেবায় দীর্ঘকাল কঠোর সাধনায় রত থাকেন, সেই প্রেরণার স্বরূপ সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলি নি । প্রশ্নটি এক বৃহত্তর জিজ্ঞাসার অংশ ঃ কোন প্রেরণা মানুষকে কোনও আদর্শগত কর্মে প্রবৃত্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে? বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন, বিজ্ঞানসাধনার অনুপ্রেরণা আসে যা থেকে তা মূলত সৃজনীশক্তির আবেগ। শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, কবি—সকলেই নিজ নিজ ধারায় প্রকৃতির কাছ থেকে প্রেরণা পান এবং প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে রূপ দিতে চান নির্বাচিত মাধ্যমের সহায়তায়—হ'ক তা রঙ, মর্মর, প্রস্তর বা মুক্তাহারের মতো সযত্ননির্বাচিত শব্দের মালা। বিজ্ঞানী প্রকৃতিরই অন্বেষক এবং প্রকৃতিও তাঁকে সমভাবে প্রেরণা যোগান। অ-ধর মননের মাধ্যমে বিজ্ঞানী আপন মনের মণিকোঠায় প্রকৃতির প্রতিকৃতি গড়েন বা ছবি আঁকেন। তাঁর প্রয়াস প্রকৃতির অফুরন্ত জটিলতাকে বিশ্লেষণ করে প্রাকৃতিক কার্যকলাপের কয়েকটি নীতি বা কার্যকারণ-সম্পর্ক নির্ধারণ—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম। এই কার্য সম্পাদনের জন্য যে-কোন শিল্পীর মতো বিজ্ঞানীকে কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করতে হয়। এই নিয়মনিষ্ঠার বিধিগুলো স্বয়ং বিজ্ঞানীই প্রবর্তন করেছেন এবং নাম দিয়েছেন যুক্তিবিজ্ঞান। প্রকৃতির যে আলেখ্য বিজ্ঞানী আমাদের কাছে উদ্ঘাটন করেন এই বিধিগুলো তাতে পালিত হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ সেই প্রতিকৃতি স্ববিরোধাভাসমুক্ত হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্ত সৌন্দর্য অবিসম্বাদিতভাবে রূপের পরাকাষ্ঠা। অন্যভাবে প্রকাশ করলে বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্যলিপ্সু ও বুদ্ধিবৃত্ত মননক্রিয়ার সমন্বয়ে উৎপন্ন ও প্রকৃতির আলেখ্যায়নে নিয়োজিত। অর্থাৎ, বিজ্ঞান সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রয়াসের মহত্তম প্রকাশ।

পরিশিষ্ট ক

পরিভাষা

অক্সিজেন	...	Oxygen
অকেন্দ্র-প্রতিসম	...	Non-centro-symmetric
অক্টোপাস	...	Octopus
অক্ষ	..	Axis
অক্ষাংশ	...	Latitude
অক্ষিপট	..	Retina
অঙ্গার	...	Carbon
অণু	...	Molecule
অণুবীক্ষণ	...	Microscope
অতিবেগুনি	...	Ultra-violet
অনিবন্ধী	...	Amorphous
অনুপাত	...	Proportion
অনুপ্রভ	...	Phosphorescent
অনুপ্রভা	...	Phosphorescence
অনুবর্তন	...	Repetition
অনুভূতি	...	Sensation
অনুভূমিক	...	Horizontal
অপদ্রব্য	...	Impurity
অপরিবাহী	...	Non-conducting
অপসরণ-বেগ	...	Recession velocity
অবদমন	...	Repression
অব্সিডিয়ান	...	Obsidian
অভ্র	...	Mica
অম্ল	...	Acid
অর্ধকেলাসিত	...	Quasi-crystalline

অর্ধ-পরিবাহী	...	Semi-conductor
অষ্টতলক	...	Octahedron
অষ্টতলকীয়	...	Octahedral
অস্র	...	Solid angle
অংস্ট্রম একক	...	Ångstrom unit
অ্যালুমিনা	...	Alumina
অ্যালুমিনিয়াম	...	Aluminium
আইসোটোপ	...	Isotope
আণবিক	...	Molecular
আধান	...	Charge
আন্তস্তলীয়	...	Interfacial
আপাত	...	Apparent
আবহ-ঘটনা	...	Meteorological phenomenon
আবহবিজ্ঞান	...	Meteorology
আবহ-বিভাগ	...	Meteorological Department
আবিষ্কার	...	Discovery
আবিষ্কারক	...	Discoverer
আরাগনাইট	...	Aragonite
আর্ক বাতি	...	Arc lamp
আর্দ্র	...	Moist
আর্দ্রতা	...	Humidity
আর্দ্রা	...	Betelgeuse
আয়তন	...	Volume
আয়নন	...	Ionisation
আয়নিত	...	Ionised
আলোক-কোষ	...	Photo-cell
আলোকন	...	Lighting
আলোকন-কাল	...	Exposure
আলোক-মান	...	Photometer

আলোক-বর্তন	...	Optical activity
আলোক-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা	...	Dispersive power
আসন	...	Mouldboard
আসমানী	...	Sky-blue
আস্তরণ	...	Emulsion (of plate)
আহ্নিক গতি	...	Daily motion
ইলেকট্রন	...	Electron
ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ	...	Electron microscope
ঈষদচ্ছ	...	Transluscent
উত্তর-পারমাণবিক	...	Sub-atomic
উৎসকূপ	...	Artesian well
উদস্থিতিবিজ্ঞান	...	Hydrostatics
উদ্ভাবক	...	Inventor
উদ্ভাবনা	...	Invention
উপত্যকা	...	Valley
উষ্ণতা	...	Temperature
উষ্ণতা, কার্যকর	...	Effective temperature
উষ্ণমণ্ডল	...	Tropics
উর্ধ্বাধ রেখা	...	Vertical line
ঋণ	...	Negative
একক	...	Unit
এক-প্রতিসরক	...	Singly refracting
এক্স-রশ্মি	...	X-rays
ঔজ্জ্বল্য	...	Brightness
কঠিন	...	Solid
কঠিনীভবন	...	Solidification
কণিকা	...	Particle
কম্পনসংখ্যা	...	Frequency
কম্বোজ	...	Mollusc

কর্পূর	...	Camphor
কস্তুরা	...	Oyster
কস্তুরা, শার্সিওয়ালা	...	Window-pane oyster
কাট্‌লফিশ	...	Cuttlefish
কাঠিন্য	...	Hardness (of solids)
কার্বন	...	Carbon
কার্বন ডাইঅক্‌সাইড	...	Carbon dioxide
কার্বোরাণ্ডাম	...	Carborundum
কালপুরুষ	...	Orion
কিমিয়া	...	Alchemy
কিরীট	...	Corona
কুঁদযন্ত্র	...	Lathe
কেন্দ্রক	...	Nucleus
কেন্দ্র-প্রতিসম	...	Centro-symmetric
কেন্দ্র-প্রতিসাম্য	...	Centro-symmetry
কেলাস	...	Crystal
কেলাসতত্ত্ববিদ	...	Crystallographer
কেলাসন	...	Crystallisation
কেলাসন-পাত্র	...	Crystallising vat
কেলাসিত	...	Crystallised
কৈশিক নল	...	Capillary tube
কোণ	...	Angle
কোণীয়	...	Angular
কোমলায়ন	...	Annealing
কোমলায়িত	...	Annealed
কোয়াণ্টাম	...	Quantum
কোয়ার্ট্‌জ	...	Quartz
ক্যাথোড-রশ্মি	...	Cathode rays
ক্যাথোড-রশ্মি কম্পনলেখ	...	Cathode-ray oscillograph

ক্যাল্ক্সপার	...	Calcspar
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	...	Calcium oxide
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	...	Calcium carbonate
ক্যালসিয়াম ফস্ফেট	...	Calcium phosphate
কুপ্রস অক্সাইড	...	Cuprous oxide
ক্রোমিক অক্সাইড	...	Chromic oxide
ক্ল্যাম	...	Clam
ক্ষয়	...	Erosion (of soil); decay (of meson)
ক্ষয়কারী	...	Corrosive
ক্ষারক	...	Alkali
ক্ষেত্র	...	Area; field
খড়িমাটি	...	Chalk
খনিজ	...	Mineral
খনিজ লবণ	...	Rock-salt
খরতা	...	Hardness (of radiation)
খোলক	...	Shell
গণ	...	Category
গতীয় শক্তি	...	Kinetic energy
গলনাঙ্ক	...	Melting point
গাইগার গণক	...	Geiger counter
গাণিতিক	...	Mathematical
গামা রশ্মি	...	Gamma rays
গুণ	...	Property
গ্যাস	...	Gas
গ্যাসীয়	...	Gaseous
গ্যাস্ট্রোপড	...	Gastropod
গ্রাম	...	Pitch (of sound)
গ্রাস	...	Eclipse
গ্র্যানিট	...	Granite

ঘটনা ... Phenomenon
ঘনক ... Cube; cubic
ঘনত্ব ... Density
ঘনবীক্ষণ-ক্ষমতা ... Stereoscopic vision
চরম ... Ultimate
চাক্ষুষ ক্লান্তি ... Visual fatigue
চাপ ... Pressure
চাপাবর্নাত ... Pressure gradient
চাপাবনমন ... Depression
চুন ... Lime
চুন, পাথুরে ... Quicklime
চুম্বক ... Magnet
চুম্বকত্ব ... Magnetism
চুম্বকীয় ... Magnetic
চুল্লি ... Furnace
চৌম্বক ক্ষেত্র ... Magnetic field
ছায়াপথ ... Milky Way
ছেদক্ষেত্র ... Cross-section
জলবিদ্যুৎ ... Hydroelectricity
জালক ... Network
জীববিজ্ঞান ... Biology
জীববিজ্ঞানী ... Biologist
জীববৈজ্ঞানিক ... Biological
জৈব ... Organic
জ্যোতির্বিজ্ঞান ... Astronomy
জ্যোতির্বিজ্ঞানী ... Astronomer
টারবো ... Turbo
টাংস্টেন ... Tungsten
টুরম্যালিন ... Tourmaline
ট্রকাস ... Trochus

ডিগ্রি ... Degree

ডোপ্‌লার-চ্যুতি ... Doppler displacement

তড়িৎ ... Electricity

তড়িৎ-চুম্বক ... Electro-magnet

তড়িৎ-চুম্বকীয় ... Electro-magnetic

তড়িৎ-পথ ... Circuit

তড়িৎ-পরিবর্তক ... Electric transformer

তড়িৎ-প্রতিরোধকত্ব ... Electrical resistivity

তড়িৎ-প্রবাহ ... Electric current

তড়িৎ-প্রবাহ প্রমাপক ... Electric current meter

তড়িৎ-প্রশম ... Electrically neutral

তড়িৎ-মেঘ ... Thunder-cloud

তড়িৎ-স্ফুরণ ... Electric spark

তড়িদাধান ... Electric charge

তত্ত্ব ... Theory

তন্তু ... Filament

তরঙ্গ ... Wave

তরঙ্গ-গতি ... Wave motion

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ... Wave-length

তল ... Plane ; surface ; face (of crystal)

তাৎক্ষণিক ... Instantaneous

তাত্ত্বিক ... Theoretical

তাপ ... Heat

তাপ-তড়িৎ ... Pyro-electricity

তাপ-পরিবাহিতা ... Thermal conductivity

তাপ-সম্প্রসারণ ... Thermal expansion

তারকা, তারা ... Star

তারকা-পুঞ্জ ... Star cluster

তুহিন ... Frost

তেজস্ক্রিয়	Radioactive
তেজস্ক্রিয়া	Radioactivity
ত্রিজ্যা	Radius
ত্রিধাবিস্তৃত	Three-dimensional
দণ্ডাংশ	Rods (of retina)
দানা	Crumb (of soil)
দিক্-স্থিতি	Polarisation (of charge)
দীপ্তি	Brightness
দূরবীক্ষণ, দূরবীণ	Telescope
দূরেক্ষণ	Television
দূরেক্ষণ গ্রাহকযন্ত্র	Television receiver
দৃষ্টিবিভ্রম	Optical illusion
দৈশিক	Spatial
দ্বাদশতলক	Dodecahedron
দ্বিনেত্র দূরবীণ	Binocular
দ্বিপারমাণবিক	Diatomic
দ্বিপ্রতিসরক	Doubly refracting
দ্বিপ্রতিসরণ	Double refraction
দ্রবণ	Solution
দ্রবণীয়	Soluble
দ্রাবক	Solvent
ধন	Positive
ধনুরাশি	Saggitarius
ধর্ম	Property
ধাতুবিদ	Metallurgist
ধাতুসঙ্কর	Alloy
নক্ষত্র-পুঞ্জ	Star
নক্ষত্র	Galaxy, stellar universe
নক্ষত্র-পরিবার	Star cluster

নক্ষত্র-মণ্ডল ... Constellation
নটিলাস ... Nautilus
নভোবিদ্যুৎ ... Atmospheric electricity
নাক্ষত্র ... Stellar
নিউটনীয় ... Newtonian
নিউট্রন ... Neutron
নিকল ... Nicol
নিয়ন ... Neon
নিয়ম ... Law
নিরোধ ... Suppression
নিঃসরণ-রেখা ... Emission line
নীহারিকা ... Nebula
নেগেটিভ ... Negative
ন্যাফ্‌থ্যালিন ... Naphthalene
পজিটিভ ... Positive
পজিট্রন ... Positron
পটি ... Band
পদার্থ ... Matter
পরম ... Absolute
পরমাণু ... Atom
পরিন্যাস ... Deposit
পরিবহণ ... Conduction; transport
পরিবাহক্ষেত্র ... Catchment area
পরিবাহী ... Conductor
পরীক্ষণ, পরীক্ষা ... Experiment
পরীক্ষণমূলক, পরীক্ষামূলক, পরীক্ষণভিত্তিক ... Experimental
পরীক্ষণাগার, পরীক্ষাগার ... Laboratory
পর্যায় ... System

পলি ... Alluvium, silt
পারমাণবিক ... Atomic
পাললিক ... Alluvial
পীড়িত ... Strained
প্রকল্প ... Hypothesis
প্রক্ষিপ্ত ... Precipitated
প্রক্ষোভ ... Emotion
প্রজাতি ... Species
প্রতিফলন ... Reflection
প্রতিফলিত ... Reflected
প্রতিন্যাস ... Attitude
প্রতিসরণ ... Refraction
প্রতিসরণাঙ্ক ... Refractive index
প্রতিসম ... Symmetrical
প্রতিসাম্য ... Symmetry
প্রতিসাম্য-শ্রেণী ... Symmetry class
প্রত্যভিজ্ঞা ... Recognition
প্রত্যাবর্তী স্তর ... Reversing layer
প্রভেদ্যতা ... Penetrability
প্রমাণ-রেখা ... Standard reference lines
প্রয়োগবিজ্ঞান, প্রয়োগশিল্প ... Technology
প্রস্তরযুগ ... Protein
প্রাকৃতিক দর্শন ... Proton
প্রাস ... Piezo-electricity
প্রিজম ... Prismatic
প্রিজমীয় ... Prism
প্রেষ-তড়িৎ ... Projectile
প্রোটন ... Natural Philosophy
প্রোটীন ... Stone age

প্ল্যাসটিক	...	Plastic
ফেল্‌স্‌পার	...	Felspar
ফোটন	...	Photon
ফ্যাকুলা	...	Facula
ফ্রাউনহোফার-রেখা	...	Fraunhofer lines
বক্রতা	...	Curvature
বজ্রঝটিকা	...	Thunderstorm
বণ্টন	...	Distribution
বর্ণান্ধতা	...	Colour-blindness
বর্ণালী	...	Spectrum
বর্ণালী, নিরবচ্ছিন্ন	...	Continuous spectrum
বর্ণালী, রেখাময়	...	Line spectrum
বর্ণালীবীক্ষণ	...	Spectroscope
বল	...	Force
বলক্ষেত্র	...	Field of force
বলবিদ্যা	...	Mechanics
বাষ্প	...	Vapour
বাহ্যাকৃতিক	...	Macroscopic
বিকিরণ	...	Radiation
বিকৃতি	...	Deformation
বিচ্ছুরণ	...	Diffusion
বিচ্ছুরিত	...	Diffused
বিতরণ	...	Distribution
বিদ্যুৎ	...	Electricity
বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘ	...	Thunder-cloud
বিদ্যুৎ-স্ফুরণ	...	Lightning, electric spark
বিভাজন	...	Fission
বিরঞ্জিত	...	Bleached
বিলম্বিত	...	Suspended

বিশ্লেষণ	...	Analysis
বিস্ফোটন	...	Burst
বিস্ফোরণ	...	Explosion
বীক্ষণ-কাচ	...	Optical glass
বীক্ষণ-যন্ত্র	...	Optical instrument
বেগ	...	Velocity
বেধশালা	...	Laboratory
বেনজিন	...	Benzene
বেলনাকার	...	Cylindrical
ব্যতিকরণ-মান	...	Interferometer
ব্যাটারি	...	Battery
ব্যাপ্ত	...	Suspended
ভর	...	Mass
ভরবেগ	...	Momentum
ভারি ইলেকট্রন	...	Heavy electron
ভিজ্যুয়াল পার্পল	...	Visual purple
ভূতত্ত্ব	...	Geology
ভূতত্ত্ববিদ, ভূবিজ্ঞানী	...	Geologist
ভূতাত্ত্বিক	...	Geological
ভূপদার্থবৈজ্ঞানিক	...	Geophysical
ভোল্ট	...	Volt
ভৌত	...	Physical
মণিক	...	Mineral
মতবাদ	...	Theory
মহাজাগতিক রশ্মি	...	Cosmic rays
মাইসেল	...	Micelle
মাত্রিক বিশ্লেষণ	...	Quantitative analysis
মাসেল	...	Mussel
মূচি	...	Crucible

মূলতন্ত্র	…	Root system
মূল বর্ণ	…	Primary colour
মূল পদার্থ	…	Element
মৃত্তিকাবিজ্ঞান	…	Soil science
মৃদু	…	Dilute
মেঘ-প্রকোষ্ঠ	…	Cloud chamber
মেন্থল	…	Menthol
মেরু	…	Pole
মেরুজ্যোতি	…	Aurora
মেসন	…	Meson
মেসোট্রন	…	Mesotron
মৌক্তিক	…	Mother-of-pearl
মোক্ষণ	…	Discharge
মোক্ষণ-নলিকা	…	Discharge tube
মৌল	…	Element
মৌসুম	…	Monsoon
ম্যাগনিসিয়াম	…	Magnesium
যন্ত্রবিজ্ঞানী	…	Engineer
যান্ত্রিক	…	Mechanical
যান্ত্রিক পীড়ন	…	Mechanical stress
যান্ত্রিক বিশ্লেষণ	…	Mechanical analysis
যুক্তিবিজ্ঞান	…	Logic
যোজন-বল	…	Valence force
যৌগিক	…	Compound
যৌগিক তারা	…	Multiple star
রন্ধ্র	…	Pore (of soil)
রম্বোহিড্রন	…	Rhombohedron
রশ্মি	…	Ray
রসায়ন, রসায়নবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা		Chemistry

রসায়নবিদ ... Chemist
রাসায়নিক ... Chemical
রিলে ... Relay
রূপ ... Quality (acoustics)
রূপান্তর ... Transmutation
রোমন্থক ... Ruminant
র‍্যণ্টগেন রশ্মি ... Röntgen rays
লগারিথম ... Logarithm
লবণাম্ল ... Hydrochloric acid
লম্বন ... Parallax
লিগ্‌নিন ... Lignin
লেখ ... Graph; diagram
ল্যামেলিব্রাংক ... Lamellibranch
শক্তি ... Energy
শক্তিকণিকা ... Quantum
শারীরবৈজ্ঞানিক ... Physiological
শিলা ... Rock
শুক্তি ... Pearl oyster
শৈথিল্য ... Hysteresis
শোষণ ... Absorption
শোষণ-বর্ণালী ... Absorption spectrum
শোষণ-রেখা ... Absorption lines
ষটকোণ ... Hexagon; hexagonal
সংকেত ... Formula
সছিদ্র ... Porous
সত্তা ... Entity
সন্দীপ্ত ... Luminiscent
সন্দীপ্তি ... Luminescence
সমধর্মী ... Homogeneous
সমবর্তক ... Polariser

সমবর্তন ... Polarisation (of light)
সমবর্তন-তল ... Plane of polarisation
সমবর্তিত ... Polarised
সমবর্তী ... Polarising
সমোন্নতি রেখা ... Contour
সম্প্রসারণ ... Expansion
সহায়ক ... Auxiliary
সাইক্লোট্রন ... Cyclotron
সার্বিক সাপেক্ষবাদ তত্ত্ব ... General theory of relativity
সিলখড়ি ... Gypsum
সিলিকন ... Silicon
সিলিকন ডাইঅক্সাইড ... Siilicon dioxide
সিলিকা ... Silica
সূক্ষ্মগ্রাহিতা ... Sensitiveness
সূক্ষ্মগ্রাহী ... Sensitive
সৃষ্টিতত্ত্ব ... Cosmogony
সেন্টিগ্রেড ... Centigrade
সেলিনিয়াম ... Selenium
সেলুলোজ ... Cellulose
সোডিয়াম ... Sodium
সোডিয়াম ক্লোরাইড ... Sodium chloride
সৌর কলংক ... Sun-spot
সৌর-বর্ণালীলেখ ... Spectroheliograph
স্তন্যপায়ী ... Mammal
স্তরমণ্ডল ... Stratosphere
স্থিতিস্থাপক ... Elastic
স্থিরতড়িৎ-উৎপাদক ... Electrostatic generator
স্বতঃভাঙন ... Disintegration
স্বপ্রভ ... Fluorescent

স্বপ্রভা	...	Fluorescence
স্বয়ংক্রিয়	...	Automatic
স্বয়ংলেখ	...	Recording
স্রোতোদ্বার	...	Sluice
হরিদাভ	...	Greenish
হিমবাহ	...	Glacier
হিমশৈল	...	Iceberg
হেলিওটিস	...	Haliotis

পরিশিষ্ট খ

ব্যক্তিনামের লিপ্যন্তর

অ্যান্ডারসন ... Anderson
আইনষ্টাইন ... Einstein
আরেনিউস ... Arrhenius
আর্কিমিদেস ... Archimedes
আবে ... Abbe
উইলসন, সি টি আর ... Wilson, C.T.R.
কৃষ্ণণ, আর এস ... Krishnan, R.S.
ক্যাভেণ্ডিশ ... Cavendish
ক্যুরি, মাদাম ... Curie, Madame
গাইগার ... Geiger
ড্যেপ্‌লার ... Döppler
থথমেস, প্রথম ... Thothmes I
দ্য ব্রগ্‌লি ... de Broglie
নিউটন ... Newton
নেডারমায়ার ... Neddermeyer
প্ল্যাঙ্ক ... Planck
ফ্রাউনহোফার ... Fraunhofer
ফ্র্যাংক্‌লিন বেন্‌জামিন ... Franklin, Benjamin
বোর, নীল্‌স্‌ ... Bohr, Niels
ব্ল্যাকেট ... Blackett
ভাভা, এচ জে ... Bhabha, H.J.
মাইকেলসন ... Michelson
মিলিক্যান, আর এ ... Millikan, R.A.
মোরে, জি ডাব্লিউ ... Morey, G. W.
ম্যাক্সওয়েল ... Maxwell
য়ুকাওয়া ... Yukawa

রকিফেলার	...	Rockefeller
রাদারফোর্ড, লর্ড	...	Rutherford, Lord
র‍্যণ্টগেন	...	Röntgen
লরেন্স, ই ও	...	Lawrence, E.O.
লিও	...	Lyot
শট	...	Schott
সরাভাই, বিক্রম	...	Sarabhai, Vikram
সিম্পসন, সর জর্জ	...	Simpson, Sir George
হাৎশেপসুৎ	...	Hatshepsut
হেল, জর্জ ই	...	Hale, George E.
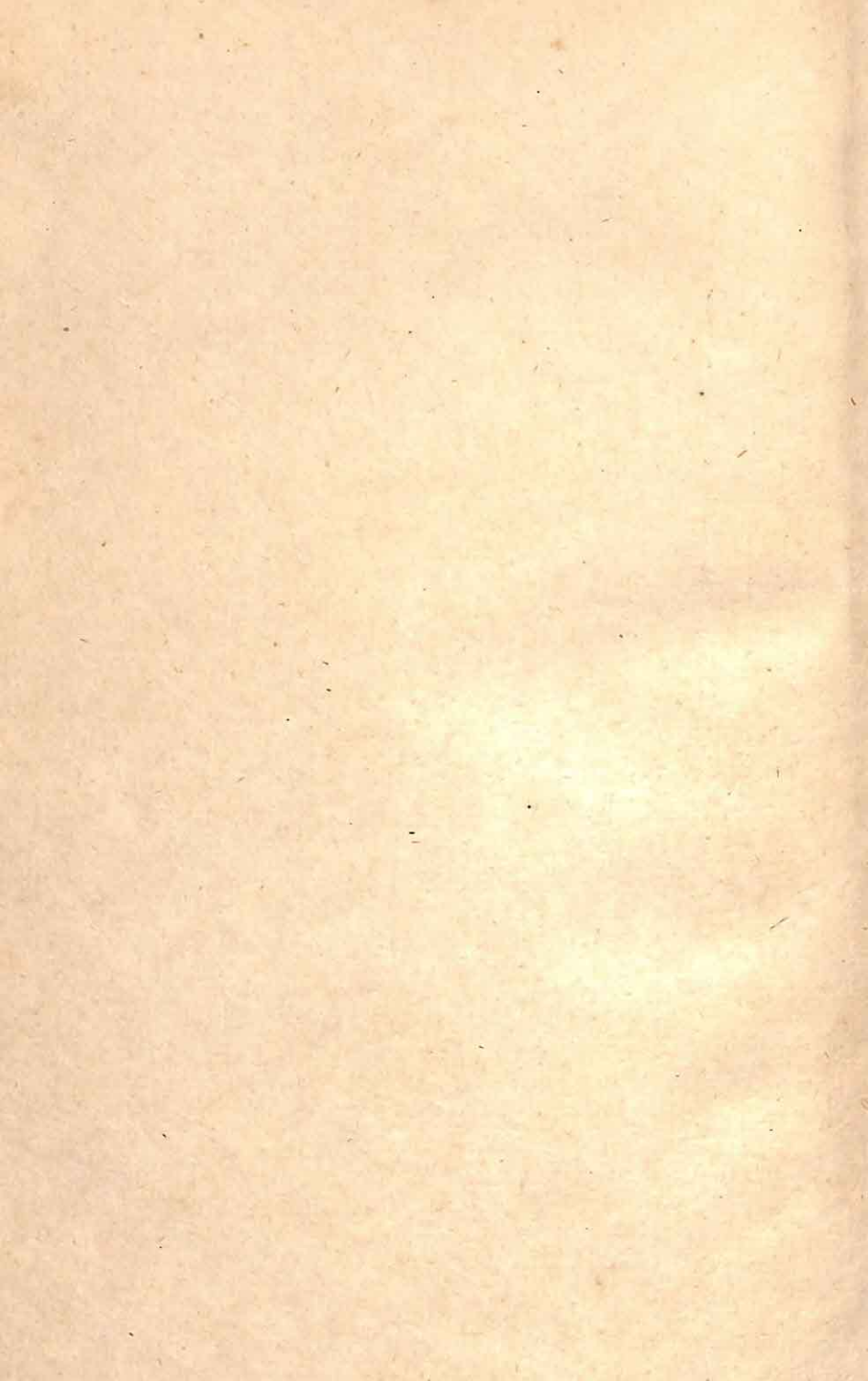
"বিজ্ঞানী মানুষ আসলে প্রকৃতির সাধক আর প্রকৃতির বিচিত্র কর্মশালা থেকেই মানুষ প্রেরণা লাভ করে থাকে। মানুষ তার চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুকে রূপায়িত ক'রে তোলে, নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির ছবি আঁকে...... এমনিভাবে মানসিক রূপ-কল্পনা গড়ে তোলার সময়ে বিজ্ঞানের সাধক মানুষ অন্যান্য শিল্পের কারিগরদের মতো কঠিন ও সুষম নিয়মনিষ্ঠার আশ্রয় নেয়, এই উদ্দেশ্যে মানুষ নিজেই নিজে থেকে কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মকানুনের প্রবর্তন করে নিয়েছে—এই সমস্ত বিধিবদ্ধ নিয়মগুলো হ'ল যুক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত.........বিজ্ঞান তাই মানুষের রূপবোধ এবং বুদ্ধিপ্রাণ মননশীলতার যুগপৎ সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের যথার্থ রূপায়ণ। কাজেই বিজ্ঞান হ'ল সবচেয়ে উ'চুদরের সৃজনীমূলক শিল্পবস্তু।"—এ কথা বলেছেন রামণ।

প্রায় দশ বছর পূর্বে আকাশবাণীর মাদ্রাজ কেন্দ্র থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক্ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ নবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এবং বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর এই কথিকাগুলো মানুষের চিন্তাধারার বিচিত্র প্রকাশ ও বিকাশের অত্যুৎকৃষ্ট সব নিদর্শন। এই কথিকাগুলোর অতুলনীয় ঋজুতা ও প্রকাশভঙ্গীর নিরাভরণ সারল্য বিজ্ঞানের ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ, উভয়ের নিকটই সমানভাবে হৃদয়গ্রাহী। আজকের দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে যখন জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উত্তরোত্তর সমাদর বাড়ছে, সেই পরিস্থিতিতে রামণের এই বেতার ভাষণগুলো অত্যন্ত সারবান, বুদ্ধিদীপ্ত ও স্থায়ী অবদান বলে চিরদিনের মতো নিশ্চয়ই স্বীকৃতি লাভ করবে।